স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র : ১৩৫৭

দাম :
ছ' টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

দরদী	...	১
গল্প নয়	...	৬
ভক্ত	...	১২
বাজিকর	...	১৮
পোষ্টার	...	২৮
অবশ্যম্ভাবী	...	৪০
বন্দিনী	...	৫৮
যযাতি	...	৭৮
উত্তর পুরুষ	...	৯৫

এই বইএর অধিকাংশ গল্পই আট দশ বছর আগেকার লেখা

দরদী

ছোট মাসীর বিয়েতে গিয়ে কাল সন্ধ্যাবেলা থেকে বিশুর মনে একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন কেবলি উসখুস করছে। জবাবটা সে কালই শুনতে চেয়েছিল। কিন্তু বিয়ে বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম্বের যা অসম্ভব ভীড়! মাকে একটু নিরালায় পাবার সুযোগ আর এলই না।

পর দিন বরকনে বিদায়ের পর বিকেলের দিকে নিজেদের বাসায় ফিরে এসেও প্রশ্নটা বিশুকে কেবলি খোঁচায়। কিন্তু বাদ সেধে বসে আছেন বাবা। সন্ধ্যে অবধি তিনি ঘরেই কাটালেন—অকারণে! আজ কি তাঁর বাইরে কোনো কাজ থাকতে নেই?

সন্ধ্যের পরে মা একটা অসমাপ্ত সেলাই-এর কাজ নিয়ে বসেছেন। ছেলে এসে মার কোল ঘেঁষে বসে। পরক্ষণে কী ভেবে ছোট চেয়ারটা সামনে টেনে আনে। মার মুখোমুখী বসে সোজা প্রশ্ন করবে সে।

কিন্তু এ কী মুস্কিল! যত সহজ ভেবেছিল, এখন দেখছে ব্যাপারটা আদৌ তত সহজ নয়! নির্জ্জন ঘর পেয়ে মাকে প্রশ্ন করতে গিয়ে সারা রাজ্যের লজ্জা এসে ভর করে তার জিভের ডগায়। আসল কথাটা আর বলা হল না। সুরু হয় তাই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে যত উপলক্ষ্যের পাঁয়তারা।

"মা !"

"বলো।" সেলাই-এর কাজ নিয়ে বসছিলেন মা। মুখ না ফিরিয়েই সাড়া দেন।

"ছোট মাসী বুঝি বিয়ে করতে চায় নি ?"

মা হেসে বলেন, "বোকা ছেলের কথা শোনো !—বিয়ে করতে চাইবে না কেন ?"

"তবে যাবার বেলায় অত কাঁদছিল যে ?—সে কী কান্না !"

"কাঁদবে না !" মার কণ্ঠস্বর বুঝি তার কনিষ্ঠা সহোদরার সদ্য বিচ্ছেদের স্মৃতিতে একটু ভারী হয়ে আসে : "এই প্রথম পরের ঘর করতে চলেছে।"

পরের ঘর ! কথাটা বিশুর কানে যেন কাঁটার মতো বিঁধে। ছোট মাসীর জন্যে তার সারা মন ভরে ওঠে সমবেদনায়। উঠবে না কেন ? মায়েরই ত আপন বোন। মুখের আদলটাও অবিকল তার মায়েরই মতো। চোখ দুটো একটু ছোট এই যা তফাৎ। যাত্রাকালে বিশুর তখন কী জানি কেন মনে হয়েছিল, তার মা-ই যেন কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুর-ঘর করতে চলেছে।

"মা !" আবার ডাকে প্রশ্নকাতর শিশু-পুত্র।

"কী ?"

"তুমিও কেঁদেছিলে ?—তোমার শ্বশুরবাড়ী যাবার বেলায় ?"

মা মুচকি হেসে চুপ করে থাকেন।

ছেলে নাছোড়। "বলো না মা, তুমিও অমনি কেঁদেছিলে ?"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ।" মা এবার বুঝি কিছুটা উত্যক্ত হয়েছেন।

পাঁচ বছরের একরত্তি ছেলে। এরই মধ্যে কী অকালপক্কই না হয়ে উঠেছে। তার সব কথারই জবাব দেওয়া চাই। ছেলের বাবার তা-ই

নির্দেশ। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে স্বামী তাকে বুঝিয়ে ছেড়েছেন, শিশু-সন্তানের স্বাভাবিক কৌতূহলে যেন বাড়ীর কেউ এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ না করে।

মায়ের কাছে যৎকিঞ্চিৎ বাধা পেয়ে বিশু আবার নিজের মনের মধ্যে ডুব দিয়েছে। মনের চোখে ভেসে ওঠে কালকের সন্ধ্যেবেলার সেই বিয়ের আসরের দৃশ্য। পর বই কি! নিশ্চয় পর। ছোট মাসী কেনই বা কাঁদবে না? নিশ্চয় কাঁদবে। কী বিশ্রী দেখতে ছোট মাসীর বর! থ্যাবড়া নাক, খাটো খাটো চুল, বাবার চেয়েও হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ। গায়ের রঙ ফরসা হলে কী হবে, দেখতে ঠিক মিত্তিরদের পাঁড়েজীর মতো জোয়ান-মদ্দ। অমন লম্বা চওড়া চোয়াড়ে চেহারার পাশে বুঝি ছোট মাসীর মতো পাতলা গড়নের মেয়ের এমন চাঁদপানা মুখখানা মানায়! হলই বা বর, রইলই বা মাথায় টোপর, গলায় ফুলের মালা আর কপাল ভর্তি চন্দনের ফোঁটা। সে যে পর! হঠাৎ বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে—নিয়ে যেতে এসেছে ছোট মাসীকে। তাই না মাসীর এত ভয়, এত কান্না। মা যতই উল্টো কথা বোঝাক না কেন, ছোট মাসীর মন চায় নি সবাইকে ছেড়ে ঐ লোকটার সঙ্গে কলকাতার বাইরে চলে যেতে। জামসেদপুর কতদূর?

মা সেলাই-এর কাজ নিয়ে তেমনি মেতে আছেন। আবার বাধা দেয় ছেলে।

"মা, ছোট মাসী আবার কবে ফিরে আসবে?"

মা হাতের কাজ সরিয়ে রেখে বলেন, "তুই এখনো বসে বসে সেই কথাই ভাবছিস?"

"হুঁ!'

"ছোট মাসীর জন্য বুঝি তোর মন কেমন করছে?"

"হ্যাঁ।—তোমার জন্যেও।"

মা হেসে ওঠেন, "আমার জন্যে? সে কি!"

"হ্যাঁ, তোমার জন্যে। এই যে বলছিলে, তুমিও অমনি করে কেঁদে কেঁদে একদিন পরের ঘর করতে গিয়েছিলে।"

মা শুধু হাসতে থাকেন মিষ্টি করে।

"হেসো না বলছি। আমি তখন সামনে থাকলে কিছুতেই তোমায় চলে যেতে দিতাম না।"

"বেঁধে রাখতিস?" মা এবার সস্নেহে ছেলেকে কাছে টানেন। ছেলেও আবেশে মায়ের কণ্ঠলগ্ন হয়ে এতক্ষণে সুযোগ বুঝে তার আসল প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করে বসে।

"মা!"

"বলো।"

"তোমার বর কে?"

"আমার বর?" মা সকৌতুক হাস্যে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "তা বুঝি তুমি জানো না!"

"বলো শিগ্‌গির, তোমার বর কে?"

"আমার বর তোমার বাবা!"

কথাটা শুনে ছেলে হেসেই অস্থির। বলে, "অ্যাঃ! তোমরা তবে নিজেরা নিজেরা বিয়ে করেছ!!"

শুনে মার হাসি আর থামতে চায় না। ছেলে হঠাৎ কেন যেন লজ্জা পেয়ে মার বুকে মুখ লুকায়। খানিকক্ষণ নীরব থেকে এক সময় মুখ তুলে তাকায় মায়ের মুখের দিকে—সেই রহস্যঘন স্থির দৃষ্টিতে যেন এক অতলস্পর্শী গাম্ভীর্য্য।

মা চেয়ে দেখেন ছেলের চোখের কোণে জল।

"ও কী রে খোকন !"

"আমি তোমায় আর যেতে দেব না, যেতে তুমি পারবে না।"

জননীর কণ্ঠ দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বিশু তার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা জানায়, "তোমাকে আর কারো কাছে যেতে আমি দেব না —কিছুতেই না।"

গল্প নয়

জমিদার বাড়ীর দুর্গা পুজা। সারা গ্রাম সরগরম। আশেপাশে দু'দশটা গাঁয়ের মধ্যে এত বড় জমিদারও যেমন আর কেউ নেই, এত বড় প্রতিমাও নেই আর কোনো পুজো বাড়ীর।

মহা ধুমধাম। সাত পুরুষের পুজোর পাট আজো ষোল আনা বজায় আছে। ঢাক ঢোল কাঁসর সানাই নিয়ে বাদ্যকরই এসেছে জন কুড়ি। আত্মীয়-স্বজনে গিশ্‌গিশ্‌ করে সাতমহলা জমিদার বাড়ী। আজ সপ্তমী। প্রথম পুজা।

জমিদারের ছোট মেয়ের বরও এসেছেন কলকাতা থেকে। বিয়ে হয়েছে আজ মাস তিনেক। তার পরে এই তাঁর দ্বিরাগমন। অল্প বয়েস, কলেজে পড়েন, টেনিস্‌ খেলেন, সিনেমা দেখেন—হয় তো বা মাঝে মাঝে এক আধটা কংগ্রেসী জনসভায়ও গিয়ে থাকেন। হস্‌টেলের বন্ধুদের সঙ্গে বড় বড় বিষয় নিয়ে জীবনে অন্ততঃ দুএকটা দিন বিচার-বিতর্কে কোন্ আর যোগ না দিয়েছেন। এ-হেন নতুন জামাইবাবু আজ বেলা দুটো থেকে মস্ত বড় সমস্যায় পড়েছেন।

ঘটনাটা এই ঃ

পাঁঠা বলি হবে। মণ্ডপের সামনে ছেলে-মেয়ে যুবা-বৃদ্ধের ঠাসাঠাসি ভীড়। চার জোড়া ঢাক আর তিন জোড়া ঢোল আর ডজন দেড়েক কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খ-সানাইর ভরাট ভয়ঙ্কর আওয়াজে সারা তল্লাট গুমগুম করে।

জামাইবাবুও বলি দেখতে এসে দাঁড়িয়েছেন চণ্ডীমণ্ডপের এক কোনে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে যূপকাষ্ঠে-বাঁধা সদ্যস্নাত ছাগনন্দনের কপালে রক্তচন্দন লেপে কণ্ঠে তার ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে গেলেন। খড়্গধারী এগিয়ে এলেন খাড়া হাতে। কিন্তু চতুর্দ্দিকে রব ওঠে—"নন্দ কোথায়? নন্দ?"

ভীড়ের মধ্য থেকে জবাব আসে "আজ্ঞে এই যে আমি।" লোকজন ঠেলেঠুলে সামনে এল নন্দ। তার হাতে একগাছা দড়ি। তারই জন্যে বলির লগ্ন পণ্ড হতে বসেছিল আর কি! এই মুহূর্ত্তে নন্দই যেন এই মহানুষ্ঠানের মধ্যমণি! "শিগ্‌গির দড়ি ধরে দাঁড়া।"—হুঙ্কার ছাড়েন স্বয়ং জমিদার। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে আছে জনতা। আর ঠক্‌ঠক্ করে শীতে কাঁপছে বলির পাঁঠা! বাজনা এবার বেজে ওঠে দ্বিগুণ জোরে। নন্দ হাঁড়িকাঠের কাছে দু হাত উপরে তুলে দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল, নিস্পন্দ।

পাঁঠা বলি শেষ। চতুর্দ্দিকে ওঠে জয়ধ্বনি। জমিদারের মুখে খুশির হাসি। পুরোহিত ঠাকুর সহাস্যে মস্ত বড় টাট থেকে টাটকা চন্দন-মাখা একটা রূপোর সিকি এনে নন্দর হাতে দিলেন। সিকিটা মাথায় ঠেকিয়ে নন্দও ভীড় ঠেলে বেরিয়ে গেল সগর্ব্বে।

দেখে শুনে নতুন জামাইএর চক্ষু স্থির!

এ আবার কোন্ নিয়ম! নিয়ম যখন, তার মানে একটা আছেই। সেই

মানেটা জানতে জামাইবাবু সটান চলে এলেন অন্দর মহলে—একেবারে 'ওগো শুনছ'র কাছে।

স্বামীর সব কথা শুনে তরুণী ভার্য্যা হেসে কুটি-কুটি, "এই কথাটা জানবার জন্যে এক ঘর লোকের মাঝখান থেকে অমন করে চোখ ইসারায় ডেকে আনতে হয় বুঝি! তুমি বড্ড ইয়ে—।"

"যা-ই হই, সে-সব রাত্তিরে শুনবো'খন। এবার বল তো, ঐ দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকার মানেটা কী?"

"কী জানি!"

"জানো না মানে!"

"ছোটবেলা থেকেই তো দেখে আসছি," চোখমুখের চাপা হাসির দ্যুতি খানিক কমিয়ে নিয়ে বধূ বললেন, "আগে ধরতো নন্দদার বাবা—সে এখন থুড়থুড়ে বুড়ো, ঘর থেকে নড়তেই পারে না। আজ বছর দশেক নন্দদাই তো দড়ি ধরে দাঁড়ায় গো।"

আচ্ছা বিপদ! নিরুপায় জামাতা এবার শাশুড়ীর শরণাপন্ন হলেন। দড়ি-মাহাত্ম্য বুঝতেই হবে।

সেখানেও ঐ একই জবাব—"জানি না তো।"

জিজ্ঞাসু জামাতার মুখের দিকে তাকিয়ে স্নেহময়ী জমিদার-গৃহিণী মৃদু হাসেন, "ওসব ধম্মকম্ম যাগযজ্ঞির ব্যাপার, আমরা মেয়ে মানুষ কটাই বা বুঝি বলো!"

জামাতা এবার এলেন বহির্বাটিতে—শ্বশুরের কাছে।

প্রশ্ন করার ধরন দেখে জমিদার মনে মনে খুশি হন না। কিন্তু নিরুপায়। এ তো আর খাস তালুকের প্রজা নয়। নতুন জামাই। শ্বশুর এক গাল কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "তোমরা আজকালকার ছেলে! সব ব্যাপারেই অর্থ খুঁজে বেড়াও। বিশ্বাসে মিলয়ে হরি তর্কে বহুদূর।

একটা কথা ভুলো না বাবা! যারা এই সব নিয়মপ্রথা করেছিলেন আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষরাও মানুষ ছিলেন—ঘাস খেতেন না।"

এবার জামাই গেলেন চণ্ডীমণ্ডপে—পুরোহিতের কাছে। প্রশ্ন শুনে তিনিও চক্ষু কপালে তোলেন, "সে কি! এর আবার—"

"কারণ তো একটা আছেই ঠাকুর মশায়!"

"হ্যাঁ···তা আছে বৈকি—নিশ্চয় আছে", পুরোহিত আমতা আমতা করতে থাকেন, "তবে কি জানো বাবা! ছোটবেলায় আমার ঠাকুরদার সঙ্গে পুজোর তিন দিন তো এখানেই কাটাতাম। নন্দার বাবা তখন দড়ি ধরতো। ঠাকুরদার কাছেই শুনেছি, এ বাড়ীর এ নিয়ম বহু পুরুষের।" এই বলে শুরু করে দিলেন জমিদার চাটুজ্জ্যে বংশের সুদূর অতীতের গৌরবময় কিংবদন্তীর রোমন্থন।

ভাল রে ভাল! এ যে দস্তুরমত হিং টিং ছট! জামাইবাবুর মাথা খারাপ। তাই মানে জানতে মরিয়া হয়ে উঠলেন। দারোয়ান হরি সিংকে পাঠিয়ে দিলেন নন্দদের বাড়ী।

নন্দ ঝুড়ি বোঝাই করে জমিদার বাড়ীর পুজোর 'সিধে' নিয়ে সবে এসে ঘরে ঢুকেছে। নতুন জামাইএর আদেশ শুনে ছুটে এল ঊর্দ্ধশ্বাসে।

এবারও সেই একই জবাব—"জানি না তো!"

"জানো না তো ধরো কেন দড়ি?" জামাইবাবুর কণ্ঠস্বরে এবার বেশ একটু ঝাঁজ প্রকাশ পায়।

"বাবা হয়তো বলতে পারেন।"

"ডেকে নিয়ে এস তোমার বাবাকে।"

"আজ্ঞে তিনি যে—"

"নড়তে পারে না? আচ্ছা, চলো। তোমার বাবার কাছে আমিই যাব।"

"সে কি জামাইবাবু!"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলো—"

চললেন জমিদারের অসহিষ্ণু জামাই। এই অগাধ রহস্যের কূল-কিনারা পেতেই হবে।

সব কথা শুনে আশি বছরের বুড়ো ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল, "জানি জামাই-বাবু! আমার ঠাকুরদার মুখে শোনা—ব্যাপারটা তাঁর ঠাকুরদা'র আমলের!"

এতক্ষণে অতল রহস্যের তল মেলে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন জামাইবাবু। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করে শোনাল: বর্ত্তমান জমিদারের বাবার বাবার—তাঁর বাবারও বাবার আমলের ঘটনা। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার। তাঁর বাড়ীর দুর্গা পূজা। লোকে লোকারণ্য। মহা ধূমধাম। দেওয়ান এসে সভয়ে নিবেদন করলেন, "এখন উপায়?"

বিপদটা হচ্ছে: যূপকাষ্ঠের কাছেই ছিল একটা নেবু গাছ—জমিদারের বড় প্রিয় কাগজী নেবু। সেবার গাছ ভরে নেবু হয়েছে—আর ফল-শুদ্ধ একটা ডাল এসে সেদিনের হাঁড়িকাঠটার উপর নুয়ে পড়েছে। গাছ না কাটলে বলি হয় না, বলি হলে গাছ থাকে না। তখন উপায় বাতলে দিলেন সে-দিনের কুলপুরোহিত। সেবার থেকে প্রতি বৎসর পুজোর তিন দিন পাঁঠা বলির সময়টাতে নন্দর বাবার যে বাবা, তার বাবারও বাবা এসে নেবুশুদ্ধ ডালটাকে দড়ি বেঁধে টেনে সরিয়ে রাখত প্রাণপণে। নির্ব্বিঘ্নে বলি হত সুসম্পন্ন আর নির্ব্বিবাদে বেঁচে ছিল নেবু গাছটা।

সেদিনের সেই জমিদার আর বেঁচে নেই তা বহু বহু যুগের কথা। সেই বড় সাধের নেবু গাছটাও মরে ভূত হয়ে গেছে তারও বহু আগে। কিন্তু

সেই চাটুজ্যে পরিবারের বংশধর আছেন তো। তাই আজও একটা লোক এসে বলির সময় দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে নির্ব্বিকার—আজও পূর্ব্বপুরুষের কুলপুরোহিতের হাত থেকে চন্দনমাখা চাক্তি নিয়ে দড়িধারী দাস পরিবারের বংশবদ উত্তরপুরুষ নন্দলাল হাসি মুখে ঘরে ফিরে যায় সগর্ব্বে!

রাত্রিবেলা বধূ বলে, "তুমি আস্ত পাগল! হেসে আমার মরে যেতে ইচ্ছে যায়। এই তুচ্ছ কথাটা জানতে তুমি ছুটে গেলে অদ্দূর!"

ওঝা

অধ্যাপক পরিতোষ সেন সেদিন বেশ মুস্কিলেই পড়লেন। এক মিনিটের জন্যে পাঁচটা-বাইশের প্যাসেঞ্জার ধরতে পারলেন না। এর পরে সাতটা পনেরোর ট্রেন। ভাবনার এমন কিছু নেই। ভাবনা তাঁর স্ত্রীটিকে নিয়ে। ফিরতে একটু দেরী হলেই লীলা বাড়ী বসে ভাবে, বুঝি বা—

অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর কল্যাণে কলকাতার অবস্থা এখন অনেক শান্ত। তবু অধ্যাপক সেন পুরোপুরি নিরাপদ বোধ করেন না। আগুন নিভে গেলেও এখানে-সেখানে কিঞ্চিৎ আঁচ এখনো টের পাওয়া যায়। কোন্ দিন আবার বিনা নোটিশে দপ্ করে কোথায় জ্বলে ওঠে তার ঠিক কি!

অধ্যাপক পরিতোষ সেন থাকেন মাইল পঁচিশেক দূরের এক ছোট্ট সহরে। রোজ রাজধানীতে আসেন। রোজ আবার যথাসময়ে ফিরে যান। কলকাতার সাম্প্রদায়িক নরমেধের পর থেকে অধ্যাপক সেনের এতকালের ঐ অভ্যস্ত জীবনে একটা হেঁচকা টান লেগেছে। আজকাল পাঁচটা বাজার আগেই তাঁকে তাড়াহুড়া করে কলেজ থেকে বার হয়ে পড়তে হয়। তাতেও বাড়ী পৌছতে রাত হয়ে যায়।

এত রক্তারক্তি হানাহানি হয়ে গেল! পরিতোষবাবুর ভাগ্য ভাল। এক বিন্দু রক্তপাতের চিহ্ন তিনি দেখেন নি—কলকাতার হিন্দু পাড়ার কোনো এক রাস্তার উপর কোথাও একটা বাসি মড়া পর্য্যন্ত নয়। কিন্তু খবরের কাগজ আর লোকের রসনা এবং তার সঙ্গে নিজের কল্পনাপ্রবণ মনের অনুমান—এই তিনে মিলে আত্মঘাতী আলোড়নের একটা ধারণা তাঁর মনে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

পরিতোষ সেন ফিলোজফির অধ্যাপক। সাইকোলজির একনিষ্ঠ ছাত্র। সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম সুরু হওয়ার পর থেকে এক বছরের মধ্যে তিনি একাধিক দৈনিক ও ততোধিক মাসিক-সাপ্তাহিকে কম পক্ষেও ডজন দেড়েক ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কারণ ও তার সন্তোষজনক সমাধানের বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন বলে বিদগ্ধ পাঠক-সমাজের ধারণা। অধ্যাপক সেনের মতে, সাম্প্রদায়িকতার রূপটা সমষ্টিগত হলেও আসলে তা ব্যক্তিগত ব্যাধি। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বিচার করলেই চলবে না। মনস্তাত্ত্বিক সমাধানের উপায়-উপকরণ নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে।

প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে পরিতোষবাবু ইতিমধ্যে কিছু কিছু পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক ভূতকে দেশের ঘাড় থেকে নামাতে হলে চালাতে হবে দেশজোড়া অভিযান। ধীরে ধীরে মানুষকে বোঝাতে হবে, শেখাতে হবে, ঠিক পথে টেনে আনতে হবে। এতেই যথেষ্ট হবে না—হতে পারে না। এমন বহু চণ্ড-স্বভাবের লোক তবু থেকে যাবে যাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাদের কেউ হবে দারোগা, কেউ জল্লাদ, জেলার, পাঠশালার গুরুমশায় বা হাসপাতালের মড়া কাটার ডাক্তার। বেছে বেছে ঐ স্বভাব-কোপনদের এক দলকে পাঠাতে হবে

বর্ষার বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে; কেউ কেউ যাবে শীতের সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে; কেউ বা বড় বড় সহরের প্লেগবাহী ইঁদুরকুল ধ্বংস করবে; কেউ বা যত মরা জন্তু-জানোয়ারের দেহে ছুরি চালিয়ে ছাল ছাড়িয়ে হাড়গোড় কাটবে, ছাঁচবে, গুঁড়োগুড়ো করবে, ছাতু-ছাতু করবে; বিশেষজ্ঞের সঙ্গে টেরাই-এর জঙ্গলে খনিজ সম্পদের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো হবে কারো কারো জীবনের ব্রত; কেউ বার হয়ে পড়বে তুষারমৌলি হিমালয়ের দুরধিগম্য অঞ্চলে দুঃসাহসিক অভিযানের টানে— ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব পথে না গেলে ভারতবর্ষ দু'ভাগ হয়েও সমাধান হল না—ভারতবর্ষ আবার জোড়া লাগলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরে আসবে না। কারণ, সমস্যার আসল কারণ বাইরে নয়, ভেতরে— মনের গভীরে।

অধ্যাপক সেনের এই মতবাদের সঙ্গে আদৌ একমত নন এমন বহু হিন্দু-মুসলমান পাঠক কিন্তু একথা স্বীকার না করে পারেন না যে, অধ্যাপক সেনের লেখায় একটা সুস্থ, নিরপেক্ষ ও উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—পাওয়া যায় এমন এক অকপট অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী যা এই দুর্ভাগা দেশে আজকাল প্রায় দুর্লভ।

আপাততঃ ঘণ্টা দুই তাঁকে হাওড়া ষ্টেশনের এই ইন্টার ক্লাস ওয়েটিং রুম-এ কাটাতে হবে। কী দুর্ভোগ! আজ সঙ্গে একখানা বইও নেই যে বসে বসে পড়বেন। একা একা কী করে কাটবে এতক্ষণ?

বাধা পেলেন অধ্যাপক। প্রথমটায় চমকে উঠেছিলেন। পরক্ষণেই নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর পাশে থপ করে যে লোকটা এসে বসে পড়ল, সে ডাকাতও নয়, গুণ্ডাও নয়—তাঁরই মত ভদ্র-সন্তান। দেখতে বেশ। গায়ের রং ফরসা। চোখে চশমা। বুকে ফাউনটেন্ পেন। কব্জিতে হাতঘড়ি। শান্ত নম্র দৃষ্টি।

বসে পড়েই লোকটা অনুচ্চ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "আপনি কোন ট্রেনে যাবেন ?

"সাতটা পনেরোর গাড়ীতে।"

"আমিও ঐ গাড়ীতেই চুঁচড়োয় নেমে যাব।"

অধ্যাপক এবার নিজের ভাবনায় মন দেবেন ভাবছেন। কিন্তু লোকটি আবার প্রশ্ন করেন, "আপনি বুঝি 'রাইটার' ?"

"না—হ্যাঁ।"

এবার গলা খাটো করে অধ্যাপক সেনের প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ভদ্রলোকটি বললেন, "ওদের কথাবার্ত্তা সব শুনছেন তো ?"

"হুঁ।"

কিছুই শুন্‌ছিলেন না অধ্যাপক। এবার শুনছেন। দু'জনেই কান পেতে আছেন।

অদূরে একটা বেঞ্চের উত্তপ্ত বিতর্ক স্পষ্ট শোনা যায় :

"—মন পড়ে আছে পাকিস্থানে। কে তোদের মাথার দিব্বি দিচ্ছে এদেশে থাকতে ? যা না চলে। দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষব না আমরা। যারা আজও ভাবছে—"

"ও জাতের মধ্যে আর যারা-টারা নেই মশায় ! সব সমান। ঝাড়েবংশে সবাইকে যেতে হবে—"

অধ্যাপক সেনের গা টিপে ভদ্রলোক আবার বললেন, "দেখছেন তো ?"

"হুঁ।"

"ওরা আবার একটা হাঙ্গামা বাধাতে চায়।"

ভদ্রলোকের এই আশঙ্কার জবাবে অধ্যাপক সেন ভরসা দেন, "বাধাতে চাইলেও আপাতত বাধাতে পারবে না। জনসাধারণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওদের আসল মতলব বুঝতে পেরেছে লোকে। ওদের—"

"আস্তে।"

"কেন. ?"

"শুনতে পাবে।"

"শুনলেই বা।"

"কেটে ফেলবে।"

অধ্যাপক হাসেন।

"হাসছেন কি! ও জাতকে দিয়ে বিশ্বাস আছে!"

অধ্যাপক সেন এবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে ধরেন।

"জাতকে-জাত ওরা হাড়ে-হাড়ে বজ্জাত—বেইমান! কুত্তার—"

"কাদের কথা বলছেন? আপনি—আপনি তবে কোন্ জাতের?"

"কেন? আমি মোছলমান।" বলেই অধ্যাপক সেনের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে লোকটি এবার তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা তাঁর মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

"এতক্ষণ সে কথা বলেন নি কেন?" অধ্যাপক বোধ হয় একটু উষ্ণ হয়েই বলেন।

"মাফ করবেন মশায়!" লোকটি ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বললেন, "ভুল করেছি। ভেবেছিলাম, আপনিও মোছলমান।—আপনাকে দেখতে মোছলমানের মতো।"

অধ্যাপক সেন মৃদু হেসে অভয় দেন, "আপনার কোনো ভয় নেই। আমি সে-রকম লোক নই।"

হিন্দুগরিষ্ঠ হাওড়া ষ্টেশনে মুসলমান ভদ্রলোকটি তবু নির্ভয় হতে পারলেন না। পরক্ষণেই সঙ্গের ছোট্ট বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে হন্‌হন করে ওয়েটিং-রুম ছেড়ে চলে গেলেন।

রাত ন'টা নাগাত বাড়ী পৌঁছলেন পরিতোষবাবু। কড়া নাড়ার

শব্দ পেয়ে স্ত্রী এসে দুয়ার খুলে দেন।

"লীলা, চট করে আলোটা নিয়ে এসো এঘরে।"

আলো এল। একটা চেয়ারে নিজে বসে আর একটা চেয়ার সামনে টেনে এনে অধ্যাপক স্ত্রীকে বললেন, "তুমি এই চেয়ারটায় আমার মুখোমুখী হয়ে বসো একবার।"

এমন অসময়ে এত কাছাকাছি বসতে বলা যে দাম্পত্য মধুগুঞ্জনের জন্যে নয় তা বুঝতে স্ত্রীর দেরী হয় না। একটু চিন্তিত হয়েই বুঝি বললেন, "ব্যাপার কী বলো তো?"

"বলছি। তার আগে কথা দাও, আমার কাছে মিথ্যে বলবে না। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। তুমি যদি—"

"এ তো আচ্ছা বিপদ! কী কথা শুনতে চাও বলো।"

"আগে বসো এই চেয়ারে," জোর করে স্ত্রীকে সামনের চেয়ারে মুখোমুখী বসিয়ে দিয়ে পরিতোষবাবু হারিকেনের শিখা এবারে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলেন।

"লীলা, আমার মুখের দিকে একবার তাকাও। হেসো না। ভালো করে দেখো আমায়।—এবার সত্যি কথা বলো। আমি কি দেখতে মুসলমানের মতো?"

স্ত্রী এবার হো হো করে হেসে ওঠেন, "সে কী কথা গো! তুমি মোছলমান হতে যাবে কেন!"

"ঠিক বলো, আমায় মুসলমানের মতো দেখায়?"

"না গো না।"

"ব্যাটা কী মিথ্যাবাদী!"

"কে?"

"পাজী, নচ্ছার, স্কাউন্‌ড্রেল্!!" অধ্যাপকের এতক্ষণের অবরুদ্ধ ক্রোধ এবার সশব্দে ফেটে পড়ল।

বাজিকর

পলাশপুরের শ্রীনাথ মুখুয্যে ভগবান দেখেছেন। কালী নয়, শিব নয়, হরি নয়, মনসা নয়, শীতলা নয়—এ-সমস্ত দেবদেবীর অধীশ্বর যিনি, এই পরিদৃশ্যমান জড়জগৎ আর জীবজগতের অতীত অথচ এরই মধ্যে ওতপ্রোত যে নিখিল চিন্ময় সত্তা, মুখুয্যে সেই একমেবাদ্বিতীয়মের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করছেন।

পলাশপুর তোলপাড়। আশ-পাশের দশ-বিশটা গ্রাম সরগরম। এ তল্লাটের কাকপ্রাণী পর্য্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শ্রীনাথ মুখুয্যে সকল কিছুর মূলাধারের স্বরূপ চিনেছেন! আজ ক'দিন ধরে মুখুয্যে মশাই নাকি থেকে থেকে মূর্চ্ছা যান আর জাগেন, জাগেন আর মূর্চ্ছা যান। কেউ বলে, ঘনঘন তুরীয়-লোকে আনাগোনা করছেন। কেউ বলে দশার মত দশা—বিষামৃতের জ্বালা! কেউ বলে, থেকে থেকে কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রত হচ্ছে কিনা তাই। কারো বা অনুমান, এটা নিঃসন্দেহে নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা, অন্ততঃ নির্ব্বাণের পূর্ব্বাভাস! এক-আধজন

অবিশ্বাসী অবশ্য এখনো মাথা নাড়ে—বলে, মুখুয্যে নিশ্চয় কি একটা মতলব আঁটছেন। আধা-বিশ্বাসীর দল জানায়, শেষ পর্য্যন্ত দেখাই যাক্ না—আগে থেকে অত সন্দেহ করার মানে হয় না। কে জানে, সত্যি-ও তো হতে পারে।

সকাল-সন্ধ্যা পথে ঘাটে, রান্নাঘরে, বৈঠকখানায় সর্ব্বত্র সবার মুখে একই কথা। শ্রীনাথ মুখুয্যে আর শ্রীভগবান! এত আলোড়নের কারণ কেবল এই নয় যে, শ্রীনাথ মুখুয্যে ভগবান দেখেছেন। তিনি নাকি ভগবান দেখাবেনও। এক-আধ জনকে নয়, গ্রামশুদ্ধ সবাইকে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবেন। চতুর্দ্দিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ। এতকাল ভগবান দেখেছেন অনেকেই, তাঁকে দেখাতে পেরেছেন কে? আজ মুখুয্যে চিরকালের সেই অসাধ্য সাধন করতে চলেছেন! কল্পনাও হার মানে!

দুষ্টু লোকে বলছে, কী কুক্ষণে সেদিন ঝোঁকের মাথায় মুখুয্যে কথাটা বলে ফেলে এখন মহা বিপদে পড়ে গেছেন। জনকয়েক কুতার্কিকের ঘনঘন প্রশ্নে উত্যক্ত হয়ে রাগের মাথায় ফস্ করে বলেই বস্লেন, "প্রমাণ? সামনের অমাবস্যার দিন সন্ধ্যারাত্রে এসো সবাই—তোমাদেরও দেখিয়ে দেব। এ-গাঁয়ের ও-গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সবাইকে দেখাব। যদি না পারি, তোমাদের সবার সামনে তখনই আমি আত্মহত্যা করে মরব; এই যজ্ঞোপবীত ছুঁয়ে আমি শপথ করছি।"

আজ সেই অমাবস্যার দিন। ভোর থেকে পাড়ায়-পাড়ায় জটলা বসেছে। কেউ বলছে, "ভগবান কী দেখাবার জিনিষ হে—ও বস্তু অন্তরের অন্তস্তলে গভীর থেকে গভীরে নেমে উপলব্ধি করতে হয়।"

কেউ সরোষ প্রতিবাদ জানায়, "অন্তরে যিনি সত্য, তাঁকে বাইরেও প্রকট হতে বাধাটা কোথায়?"

এমনি সব আলোচনায়, গবেষণায়, কল্পনায়, জল্পনায় দুপুর গড়িয়ে যায়। আজ কারো মুখে আর কোনো কথা নেই। মেয়েরা চুল বাঁধতে ভুলে গেছে, পুরুষেরা তামাক খেতে ভুলে যাচ্ছে। সবাই ভাবছে একই কথা—সন্ধ্যা কখন হবে। তারপর? তারপর এই জীবনের সব পাপ-তাপ ধুয়ে-মুছে যাবে, সব আশা সব আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটবে। জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচরের, চেতনালোকের ওপারের, জন্ম-জন্মান্তরের চিররহস্যের সেই চৈতন্যস্বরূপ পরমপুরুষকে আজ চর্ম্মচক্ষে দেখতে পাবে—অতীন্দ্রিয় হবেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য!

বেলা যায়-যায়। মাঠ-ঘাট পার হয়ে পিলপিল করে লোক চলেছে পলাশপুরের মুখুয্যে বাড়ীর দিকে। বিশ্বাসী, আধা-বিশ্বাসী, সিকি-বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী—মেয়ে, পুরুষ, ছেলেপিলে দলে দলে সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পথ চলছে। কি জানি, শেষকালে যদি ভিড় ঠেলেঠুলে জায়গা না পায়! ঠিক ভরসন্ধ্যায় মুখুয্যে ধ্যানে বসবেন। মুখুয্যে ধ্যান ভেঙ্গে উঠবেন যখন তখনই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! যাক্, আর কয়েক দণ্ড ধৈর্য্য ধরে কাটিয়ে দিতে পারলেই—ব্যস্! তারপরেই এই জীবনের চরম চাওয়ার পরম পাওয়া!

সন্ধ্যার বহু আগেই মুখুয্যে বাড়ীর মস্ত বড় উঠোন লোকে লোকময়। একপাশে মেয়েদের জন্যে বসবার জায়গাটার তিন দিকে চিক্ টাঙানো। গাঁয়ের মেয়েরা গলা ছেড়ে আলাপ করছে। গাঁয়ের বধূরা ঘোমটার তলে ফিসফিস করে। কারো ছেলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে ওঠে। কারো বা কোলের নাতিনী এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাজ্জব কাণ্ড! দেখে শুনে মনে হয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রস্থল

আজ পলাশপুরের মুখুয্যে বাড়ী। বৈঠকখানার ঘর থেকে সরকারী সড়ক পর্য্যন্ত রাস্তার দু'ধারে ছোটখাট একটা মেলা বসে গেছে। পান-বিড়ির দোকান, চা-সরবতের দোকান, বুঁদে-জিলিপির দোকান, জাপানী চুড়ি-খেলনার দোকান, নানান খাবারের দোকান—ভগবান দেখে ফেরার সময় দু' পয়সা খরচ করতে কোন্ লোক আর পরাঙ্মুখ হবে। সুব্যবস্থার জন্যে এক দল স্বেচ্ছাসেবকও তৈরী হয়ে আছে। এত লোকের সমাগমে আইন-শৃঙ্খলা যাতে নষ্ট না হয় তা দেখবার জন্যে বহমৎপুর থানা থেকে দারোগা আর কনষ্টেবলও যথাসময়ে পৌঁছে গেছে।

মুখুয্যে বাড়ীর কোলাহলে সারা গ্রামের আকাশ-বাতাশ গমগম করে। একান্তে কেউ মালা—জপ করছেন। কেউ একমনে শ্রীকৃষ্ণের শতনাম পড়ছেন। কেউ গলা ছেড়ে ভজন গাইছেন। এক কোণে খোল-করতাল সহকারে একদল কীর্ত্তন সুরু করেছে। সময় ক্রমেই এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসে এই জীবনের পরম প্রাপ্তির চরম মুহূর্ত্ত!

পেট্রোম্যাক্স-এর আলোয় সব-কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। উঠোনে যত লোক, তার চেয়েও বেশী লোক রয়েছে কাছেপিঠে, এ-ঘরের মধ্যে ও-ঘরের বারান্দায়—যতদূর দৃষ্টি যায় বাড়ীর শেষ সীমানা পর্য্যন্ত কেবল নরমুণ্ড! অপার্থিব প্রত্যাশায় শত শত নরনারী উদ্বেল, উদগ্রীব।

মুখুয্যে পূজোর ঘরের কপাট বন্ধ করে বহুক্ষণ ধ্যানে বসেছেন। তিনি ধ্যান ভেঙ্গে বাইরে এসে দেখা দিলেই বুঝতে হবে, সময় হয়েছে। সকলেরই দৃষ্টি তাই থেকে থেকে পূজোর দালানের দুয়ারে নিবদ্ধ। মাঝে মাঝে বেজে উঠছে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর। মেয়েরা দেয় থেকে থেকে হুলুধ্বনি।

ঘণ্টাখানিক বাদে অসংখ্য উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন শ্রীনাথ

মুখুয্যে। সঙ্গে সঙ্গে সহর্ষ কল-গুঞ্জন তাঁকে অভিনন্দিত করল। মুখুয্যের চোখে-মুখে পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি। পরিধানে পট্টবস্ত্র, কপালে চন্দনের ফোঁটা, শিখাগ্রে বাঁধা ছোট্ট একটা জবাফুল। তিনি হাত তুলে ইসারা করতে না করতেই সমবেত কোলাহল এক মুহূর্তে থেমে যায়। সেই উৎকর্ণ স্তব্ধতার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে তিনি সুরু করলেন, "আজ এই পার্থিব জগতের এক মহা মাহেন্দ্রক্ষণ! এতকাল যিনি কেবল ভাগ্যবান ধ্যানী যোগী মুনিঋষিদেরই দর্শন দান করেছেন, ব্যক্তিবিশেষের একান্ত নিজস্ব উপলব্ধির বাইরে যিনি ধরা-ছোঁয়া দেন নি, সেই তিনি আজ তাঁর নতুন লীলায় প্রতিভাত হবেন। এত লোক এক সঙ্গে তাঁর দিব্য সত্তার প্রত্যক্ষ আস্বাদ পাবে—তাঁকে দু'চোখ ভরে দেখে নেবে। আজ থেকে চিরতরে দূর হবে যত নাস্তিকের অবিশ্বাস, যত দুর্জ্ঞেয়বাদীর সন্দেহ-সংশয়। আজ থেকে—"

মুখুয্যে এবার কথার মাঝখানে থেমে যান। ভাবালু দৃষ্টি বুলিয়ে একবার সম্মুখস্থ একাগ্র নৈঃশব্দের নাড়ি পরীক্ষা করে নিলেন। খানিক এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ঊর্ধ্বে চোখ তুলে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার আরম্ভ করলেন, "তোমার বিধান তুমিই জানো। আমি কেবল উপলক্ষ্য। আমার মতো অধমের মধ্য দিয়ে কেন যে তুমি এই অভিনব লীলা দেখাচ্ছ তা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারলাম না প্রভু।—বন্ধুগণ! আমি মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ নই। তোমাদের মতো ভালোয়-মন্দয় সাদায়-কালোয় মেশানো সাধারণ এক দীন সেবক। করুণাময়ের অপার কৃপা আমার একেলার ধন নয়। আমি যা পেয়েছি, যা দেখেছি, যা জেনেছি, যা বুঝেছি তা তোমাদেরও সম্পদ, তাতে তোমাদেরও সমান অধিকার। আজ আমার মধ্য দিয়ে তাঁকে তোমরা দ্যাখ, চেন, মান, ধন্য হও!"

ভাবাবেশে মুখুয্যের কণ্ঠস্বর কয়েক পরদা নেমে এলো। খানিক চোখ বুজে স্তব্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। এখানে-ওখানে বিস্ময়াবিষ্টের দল বলাবলি করছে অনুচ্চ কণ্ঠে:

"মুখুয্যের মুখখানা দেখছ তো? কেমন এক জ্যোতি মাখানো!"

"মাথার কাছে আলোর চক্রের মতো হঠাৎ কী একটা যেন জ্বলে উঠল না?"

"শক্তি এসে ভর করেছে সারা দেহে।"

মুখুয্যে আবার হাত তোলেন। বিচিত্র বিচ্ছিন্ন যত অনুচ্চ সংলাপ এক মুহূর্ত্তে বন্ধ হয়ে যায়।

"তোমরা তবে প্রস্তুত?"

মুখুয্যের প্রশ্ন শুনে সবাই উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

"ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পেতে তোমরা ইচ্ছুক?"

"হ্যাঁ," শত শত সম্মিলিত কণ্ঠস্বর জবাব দেয়।

"তার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছ?"

"এসেছি।"

"বাসি কাপড় পরে কেউ আসো নি তো?"

"না।"

"আজ কেউ মাছ-মাংস খাওনি তো?"

"না—না।"

"আমি যা-যা বলেছিলাম তা মেনেছ? আজ সারাদিন সাত্বিক আচার পালন করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ!—সবাইকে একসঙ্গে দেখানো সম্ভব নয়। আমি এখন পূজোর ঘরে যাচ্ছি। পঁচিশ জন করে দল বেঁধে ভেতরে যাবে। ভলান্টিয়ারদের

কথা মেনে চলো। কেউ শৃঙ্খলা নষ্ট করো না। ইতিমধ্যে মন থেকে যত সব কুচিন্তা, যত লাভ আর লোভ, ক্ষয় আর ক্ষতির কথা মুছে ফ্যালো। আর সবাই মিলে একবার বলো দিকি নিঃ জয় জগদীশ্বর!"

"জয় জগদীশ্বর!" গগনভেদী আওয়াজ। মুখুয্যে মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে যান। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরগুলো এবার চতুর্গুণ আওয়াজ করে বেজে ওঠে। মেয়েরাও ঝাঁকে ঝাঁকে হুলুধ্বনি দেয়। মহালগ্ন প্রত্যাসন্ন!

সহসা এক ভলান্টিয়ার চিৎকার করে উঠল, "এক নম্বর দল উঠে আসুন।"

উঠোনের পূব-উত্তর কোন থেকে পঁচিশ জন লোক লাফ মেরে উঠে দাঁড়ায়। স্বেচ্ছাসেবককে অনুসরণ করে উঠোন ছেড়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে রকের উপর উঠে একজনের পর একজন করে পুজোর ঘরে ঢুকতে থাকে। বাইরের উৎসুক জনতা কৌতূহলের ভারে স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে মনে তাদের সহস্র জিজ্ঞাসা। কী দেখাবেন? কেমন করে দেখাবেন? কতক্ষণ দেখাবেন? যদি না দেখাতে পারেন? মুখুয্যে সবার সামনে আজই প্রাণত্যাগ করবেন? জনমণ্ডলী উদ্বেল।

এদিকে পুজোর ঘরের দুয়ার-জানালা সব বন্ধ। ভক্তমণ্ডলীর সামনে একটা বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীনাথ মুখুয্যে। তার সামনেই বড় একটা ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। রাশিকৃত পুজোর ফুলের মৃদু-মধুর গন্ধ সারা ঘরে ভুরভুর করে।

ধূপের ধোঁয়া নাকে-চোখে জ্বালা ধরায়।

"সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে খানিকক্ষণ কেবল আমার কথা ভাবো—আমার মধ্য দিয়েই তাঁকে দেখতে পাবে।" মুখুয্যে হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে

প্রদীপের শিখাটা নিবিয়ে দিয়ে ঘর একেবারে অন্ধকার করে ফেললেন, "সকলে একদৃষ্টে বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকো—আমার দিকে। একটু বাদেই সেই জ্যোতির্ম্ময় অখিল সত্তাকে দেখতে পাবে।—কিন্তু," মুখুয্যে এক মুহূর্ত্ত থমকে থামেন। জীবন্ত অন্ধকারের নাড়ি পরীক্ষা করে পরক্ষণেই আবার সুরু করেন: আজ সন্ধ্যেবেলার ধ্যানের মধ্যে তিনি আমায় একটা আদেশ জানিয়েছেন। সেই প্রত্যাদেশের কথা তোমাদের এখনই বলতে হবে।"

কী সেই প্রত্যাদেশ? একঘর নরনারী উৎকর্ণ হয়ে রইল নিরুদ্ধ নিশ্বাসে।

"তিনি জানিয়েছেন, সকলকেই তিনি আজ দেখা দেবেন—শিশু, নারী, সবল, দুর্ব্বল, রোগী, ভোগী—সব।" কিন্তু অকারণে একটু ঢোক গিলে অমনি আবার বলে চলেন মুখুয্যে, "কিন্তু জারজ সন্তান যারা, কেবল তাদেরই তিনি দেখা দেবেন না। তোমাদের মধ্যে কেউ জারজ থেকে থাকলে, বার হয়ে যেতে পারো। তার এখানে থেকে কোনো লাভ নেই—বেজম্মারা তাঁর দর্শন পাবে না!"

ঘরময় এক অগাধ স্তব্ধতা। মুখুয্যে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জানান, "সতী মায়ের সুসন্তান ছাড়া আর সকলে বেরিয়ে যাও।"

অন্ধকারের মধ্যে পঁচিশজন মনুষ্য সন্তান এ ওর মুখের দিকে তাকায়। মানে, কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না।

"এ ঘরের মধ্যে এখন জারজ সন্তান কেউ নেই?"

সকলেই নির্ব্বাক! সারা ঘরের এখন বুক টিপ টিপ করে।

"নেই তো কেউ? ভালো কথা। এবার তবে, অন্ধকারে শব্দ লক্ষ্য করে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক।" কয়েক মুহূর্ত্ত

নীরব থেকে মুখুয্যে এবারে আস্তে আস্তে টেনে টেনে বলে যান "তিনি ঐ আসছেন।—এসে গেছেন। ঐ যে···এই যে। ছাখো ছাখো, দুচোখ ভরে দেখে নাও।"

কয়েকটি অসহ্য অসহিষ্ণু মুহূর্ত্ত।

"দেখেছ ?"

পঁচিশ জনের কারো মুখেই টুশব্দ নেই।

"এই যে এদিকে। দেখছ ?"

তেমনি নিরেট নিঃশব্দ অন্ধকার।

"এখনো ছাখোনি ? সতী মায়ের সন্তানের দল! অন্ধকার উদ্ভাসিত করে আজ যিনি অন্তরে বাহিরে একাকার হয়ে ইন্দ্রিয়বোধের নাগালের মধ্যে মূর্ত্তি ধরে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে তোমরা এখনো দেখছো না ?

"দেখেছি, দেখেছি।"—একবাক্যে পঁচিশটি কণ্ঠ সাড়া দেয়।

"তাঁর দর্শন তবে পেয়েছ ?"

"পেয়েছি, পেয়েছি।"

"ধন্য হও। শুদ্ধ হও।—এবার এক এক করে বাইরে যেতে পার। নতুন দল অসেবে।"

প্রথম দল বার হয়ে যায়। যেতে যেতে এ ওকে ফিসফিস করে প্রশ্ন করে, "দেখেছ তো ?"

"দেখেছি। কী জ্যোতি!"

"কেমন দেখলে ?"

"সে কী করে বোঝাব ভাই! দেখতে দেখতে কী একটা আলোয় সারা ঘর ভরে গেল!"

পরবর্ত্তী দল পূর্ব্বদলের পাশ কেটে পূজোর ঘরে যেতে যেতে অসহিষ্ণু প্রশ্ন করে, "দেখেছ তোমরা ?"

এক সঙ্গে হয়ে জবাব আসে, "হ্যাঁ-হ্যাঁ। দেখেছি দেখেছি।"
ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে মুখুয্যে বাড়ীর মস্ত উঠোনটা খাঁ-খাঁ করে। দলে দলে যে যাঁর বাড়ী ফিরে গেছে। পথে পথে সবার মুখে ঐ একই কথা "দেখেছি, দেখেছি।"

পোষ্টার

সামনের দেয়ালে আবার একখানা পোষ্টার পড়েছে।

রাস্তা দিয়ে কত লোক যায়। কেউ কেউ পড়ে দেখে। কেউ দেখেও দেখে না; কারো বা নজরেও পড়ে না। তবু আমাদের এই ফ্ল্যাট বাড়ীটার মুখোমুখী রাস্তার ওপারের ঐ দেয়ালের গায় দু'চার দিন পর পর পোষ্টার মারে। কে বা কারা মারে জানি না। জানবার চেষ্টাও করি না। ছা-পোষা কেরানী। কে যায় যত সব হাঙ্গামা-হুজ্জতের নেপথ্যের কথা জানতে? যার খুশি মারুক, যার ভাল লাগে পড়ুক।

তবু না পড়ে পারি না। এত কাছে, একেবারে মুখোমুখী, তাই। আমার দোতালার শোবার ঘরের মধ্য থেকে গোটা দেয়ালটা চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ি না কখনো। নরম নিরীহ পোষ্টার:

সরবরাহ মন্ত্রী বলেন, কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়াছে: তবে কাপড়ের দাম কমে না কেন?

কেন কমে না সেকথাই ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে যাই। রোজ সকালে চা খাওয়ার পরে রাস্তার দিকের রকে গিয়ে বসি। পাশের বাড়ীর অধ্যাপক পরেশবাবু আসেন তার ইংরেজী সংবাদপত্রখানা সঙ্গে করে। আমারই পাশের ফ্ল্যাটের ইন্‌কাম-ট্যাক্স আপিসের ধনঞ্জয়বাবু আসেন তার বিশ বছরের প্রিয় বাংলা খবরের কাগজখানি নিয়ে।

"দত্ত মজুমদারের খাটালের দেয়ালটা দস্তুরমতো একটা সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়াল।"

"তাই তো দেখছি।" ধনঞ্জয়বাবুর পরিহাসের জবাবে বললাম, "ইদানীং একটু বেশী রকম বাড়ছে খবরের সংখ্যা।"

সংবাদপত্র থেকে মুখ তুলে অধ্যাপক পরেশবাবু বলে উঠলেন, "এতে আশ্চর্য্য হবার কী আছে? হালে খবরের কাগজওয়ালারা নীতি বদ্‌লেছেন : ঘটে যাহা সব সত্য নয়। তাই পছন্দসই খবর না হলে—তা সে যত বড় অঘটনই হোক না কেন—আজকাল তা সংবাদপত্রে অপাঙ্‌ক্তেয়। ফলে একঘরে খবরগুলো ঠাঁই নিচ্ছে দেয়ালে দেয়ালে।"

"যাই বলুন, ও-সব পোষ্টার ফোষ্টার মেরে কিচ্ছু হয় না।" ধনঞ্জয়বাবু গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করেন, "কী লাভ হয় এতে? ক'জন লোক পড়ে মশায়?"

"শত হলেও খবরের কাগজ!" বললাম, "ছাপার হরফের একটা যাদু আছে যেন!"

"হ্যাঁ, একেবারে বেদবাক্য—তা সে যত বড় মিথ্যাই ছাপা হোক্ না কেন।" অধ্যাপক ফোড়ন কাটেন।

শুনে খুসি হই না। অধ্যাপকের মতামত মাঝেমাঝে একটু উগ্র হয়ে ওঠে। তবু আমাদের বন্ধুত্বে কখনো টান পড়ে না। তাঁর সঙ্গে একটা

জায়গায় আমাদের দু'জনের স্বভাবের মিল আছে। গোলযোগের গন্ধ পেলে তিনিও দূরদূর দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলেন।

ধনঞ্জয়বাবু না বলে পারলেন না, "আপনি তো বক্তৃতার ঝোঁকে অনেক কথাই বললেন। বিপদের কথাটা একবার ভেবে দেখেছেন?"

"এতে আমাদের ভয় পাবার কী আছে মশায়?" অধ্যাপক প্রশ্ন করেন।

"কে বলতে পারে হঠাৎ একদিন সার্চ টার্চ হবে কিনা। অনর্থক হয়রানী কে চায় মশায়! আমাদের এই বাড়ীটাতে ছেলে ছোক্‌রা—তা আট দশ জন তো হবেই। ধরে নিয়ে গেলেই হল। আজকাল কি আর আইন টাইন আছে!"

চেয়ে দেখি মই বেয়ে উঠে পোষ্টার লাগাচ্ছে দেয়ালে—সিনেমা কোম্পানীর নতুন ছবির সচিত্র বিজ্ঞাপন। "কন্‌ট্রোল তুলে দেবার পর তিন মাসে কাপড়ের কলওয়ালারা একশো কোটি টাকা মুনাফা লুটেছে!" দু'তিন দিন আগের সেই বড় বড় হরফের পোষ্টারটাকে একেবারে ঢেকে দিল ভারতবিখ্যাত চিত্রতারকার তিনরঙা আবক্ষ মূর্তি।

পরদিনই আবার একখানা। এবার পরোক্ষ কায়দার এক উপভোগ্য পোষ্টার: পুরোদমে চোরাকারবার চালাও। "ক্ষমতা হাতে পেলেই চোরা-কারবারীদের ফাঁসি দেব"—পণ্ডিত জওহরলাল। এক বছরে ক'জন ধরা পড়েছে? মাভৈ নিখিল চোরাকারবার সমিতি।

যথাসময়ে রকের আড্ডায় এসে বসেছি! অধ্যাপক সহাস্যে বললেন, "পোষ্টারওয়ালারা দেখছি নতুন টেকনিকের খেলা দেখাতে সুরু করল!—আজ লোক টানছে মন্দ নয়।" দেয়ালের কাছে ছোটখাটো

ভীড় জমেছে। বেশীক্ষণ নয়। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে লোকে থামে, দেয়ালের কাছে এগিয়ে যায়। পড়ে, হাসে, টীকাটিপ্পনিও করে। খানিক বাদে ধনঞ্জয়বাবু এসেই জানালেন, "শুনেছেন তো?"

"কী?"

"যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। এপাড়ায় টিকটিকির আনাগোনা সুরু হয়েছে।"

"মানে?"

"কাল দুপুরের দিকে আশপাশের দোকানগুলোর লোকজনেদের তারা—সি-আই-ডি'র লোকই হবে—বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে। রসুল মিঞাকে নাকি শাসিয়ে গেছে—বলে গেছে নজর রাখতে।"

আমাদের এ-বাড়ীরই গায়ে লাগানো রসুল মিঞার বিড়ির দোকান। হাঁক দেই। রসুল হাতের কাজ ফেলে রেখে চলে আসে।

"কাল নাকি পাড়ায় পুলিশের লোক এসেছিল?"

"মালুম নেহি।"

"তোমার দোকানে হে"—ধনঞ্জয়বাবু জোর দিয়ে বলেন।

"নেহি তো বাবু।"

এবার প্রশ্ন করেন পরেশবাবু, "ও সব পোষ্টার কারা লাগায় জানো? তুমি তো সব সময় সামনেই থাকো!"

"ম্যায় তো হর-বক্ত কাম পরহি রহতা হুঁ বাবু। ঔর বাংলা জবান তো মুঝে মালুম নেহি হোতে হ্যায়!"

"আরে বাংলা বাত হিন্দী বাতের কথা হচ্ছে না।" ধনঞ্জয়বাবু প্রায় রুখে ওঠেন, "দিন দুপুরে ও সব কারা এসে মেরে রেখে যায় তুমি তার কিছুই জানো না বলতে চাও?"

"কুছ কুছ দেখতা হুঁ। কভি বাবু লোক লাগাতে হেঁ, কভি মজদুর-লোক ভি লাগাতে হেঁ।"

রসুল চলে যেতেই অধ্যাপক বললেন, "যা-ই বলুন না, লোকে ওসব পড়তে চায়। দেখছেন তো এত পোষ্টার পড়ছে, কৈ ছিঁড়ে ফেলছে না তো কেউ।'

দেয়ালের কাছে আবার একটা ছোট্ট ভীড় জমেছে।

দিন চারেক বাদে।—একখানা বড় আকারের তথ্যভারী নীরস পোষ্টার: পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা বেতন পান ও নয় হাজার টাকা ভাতা পান। এ ছাড়া তাঁহার মস্কোর অফিসের জন্য ব্যয় হয় বৎসরে ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। এ টাকা কার? তোমার—আমার—কোটি কোটি ভারতবাসীর।

ধনঞ্জয়বাবু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন—পড়ছেন না। পড়ছে জন-কয়েক পথচারী: কারখানায় যাবার পথে শশব্যস্ত শ্রমিক, রেশনের থলে হাতে চশমা-পরা কেরাণী ভদ্রলোক, এক রাজ্যের সংবাদপত্র বগলদাবা করে দাঁড়িয়ে এক ছোকরা বয়েসী হকার।

ধনঞ্জয়বাবু শঙ্কা প্রকাশ করেন, "এবার নিশ্চয় পুলিশের উৎপাত স্থরু হবে। বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

"কেন? নতুন খবর তো কিছু দিচ্ছে না। এ সব ফ্যাক্টস্ ফীগারস্ তো সেদিন খবরের কাগজেই পড়েছি।"

"তা হলে কী হয়! খবরের কাগজ কি আর এ সব খবর এমন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়!"

"তা বটে।"

অধ্যাপক দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন। বললাম, "কী ভাবছেন পরেশবাবু?"

"ভাবছি—রোল্‌স্‌ রয়েস্‌ এ্যাডমিনিস্‌ট্রেশন্‌ ইন এ বুলক্‌-কার্ট কান্‌ট্রি!" একটু হেসে বললেন অধ্যাপক, "এ উক্তি করেছিলেন সেকালের এক মডারেট নেতা। তিনি আজ ফিরে এলে নিশ্চয় এক্‌স্‌ট্রিমিষ্ট লেবর লীডার বলে স্পেশাল পাওয়ার্স এ্যাক্ট-এর বেড়াজালে পড়বেন।"

ধনঞ্জয়বাবু এক টিপ নস্যি নিতে নিতে সেদিনের মতো আবার জোর অভিমত জানান, "এতে কোনো লাভ হয় না। ক'জন লোক পড়ে এ সব? আর পড়েই বা হচ্ছে কী?"

"কী হয় না-হয় জানিনে। তবে আপাতত আমর পনেরো বছরের ছেলেটার মগজে কিঞ্চিৎ শ্লোগানের ধোঁয়া ঢুকেছে।" পরেশবাবু হেসে বলেন।

আমার বড় ছেলেটাও ঐ বয়েসী। সুতরাং উৎকর্ণ হয়ে শুনে যাই।

"—গেল মাসে আমাদের ঠিকে-ঝি সাতদিন কামাই করেছে। বলে, অসুখ করেছিল। আমার তা বিশ্বাস হয় নি। হিসেব করে এ মাসে সাত দিনের মাইনে কম দিয়েছি বলে আমার পুত্র তার মায়ের কাছে নাকি মন্তব্য করেছে, বাবার বড়ো পেটিবুর্জোয়া মেণ্টালিটি।"

"বলবেন না আর!" বলছেন এবার ধনঞ্জয়বাবু, "আমার কনিষ্ঠ সহোদরের বড় বড় কথার ঠেলায় গায় জ্বালা ধরে। ইদিকে কলেজের পড়া তো সিকেয় উঠেছে। সেদিন বই নিয়ে গুন্‌গুন্‌ করছে। একটু পরখ করলাম, বলতো ষ্টক্‌ আর শেয়ারে তফাৎ কী? বলে কী না, ও

সব কথা তোমরা জানবে—আমাদের জন্যে নয়। ভবিষ্যতে ষ্টক একৃচেঞ্জই থাকবে না, তার আর ষ্টক আর শেয়ারের তফাৎ।"

পরেশবাবু আর আমি একসঙ্গে হেসে উঠি। হাসেন ধনঞ্জয়বাবুও, কিন্তু পরক্ষণেই যেন একটু গম্ভীর হয়ে বলতে থাকেন, "আমরাও তো তাই চাই। কে না চায় বলুন। তাই বলে কি আজই সব হবে, না তা হতে পারে? ধীরে ধীরে আসবে সব। এখনই একৃষ্ট্রীমিষ্ট হয়ে কোনো লাভ আছে? একৃষ্ট্রীমিস্‌ম মানেই ভায়লেন্স, আর ভায়লেন্স বিগেট্‌স ভায়লেন্স!" বলেই ধনঞ্জয়বাবু এতক্ষণে একটা উঁচুদরের কথা বলতে পেরেছেন ভেবে খুশির হাসি হাসেন।

পর পর দিন কয়েক নতুন করে পড়ল আবার পুরনো পোষ্টারগুলো: ছাঁটাই করা চলবে না।......জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই।......বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত কর। ইত্যাকার।

পড়ে—সবাই বুঝি পড়ে। অন্ততঃ আমার গৃহিণীও যে মাঝেমাঝে পড়ে তার প্রমাণ পেয়েছি। কালোবাজারের প্রসঙ্গে সেদিন বেশ প্রাসঙ্গিক-ভাবেই ঝেঁজে উঠেছিল, "গবর্ণমেণ্ট আমার হাতে দিক না সব ভার বুঝিয়ে। তোমাদের ঐ চোরাবাজার একদিনেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করব দেখে নিয়ো।"

আজকের আসরে নীচের তলার পেছন দিকের ফ্ল্যাটের কালীবাবুও আছেন।

বললাম, "বাড়ীতে আজকাল গিন্নীরাও যে পলিটিক্স সুরু করে দিলে মশায়।"

"দেবে না!" কালীপদবাবু বললেন, "এতকাল পলিটিক্স ছিল বাইরে বাইরে। হাল আমলে তা ঘরে এসে ঢুকেছে—একেবারে রান্নাঘরের হাঁড়ির মধ্যে।"

"হ্যাঁ, পেটে টান পড়লেও বস্ত্র আপনি আসে", টিপ্পনী করলেন অধ্যাপক।

চেয়ে দেখি একজন আধা-বয়েসী লোক দেয়ালে একখানা পোষ্টার লাগিয়ে চলে গেল। মফস্বলে কোথায় এক ভুখা-মিছিলের উপর পুলিশ লাঠি চালিয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত খবর।

কালীপদবাবু রসিক লোক। তবে মাঝেমাঝে বড় মাত্রা ছাড়িয়ে যান। আরো একটা দোষ আছে। একবার একটা কথা পেলেই ব্যস্। আর কাউকে কথা বলতে দেবেন না। সুরু করে দিলেন, "আজকাল ঐ এক হিড়িক। কথায় কথায় মিছিল। চাল চাই, কাপড় চাই, হেন চাই, তেন চাই।—কেবল চেয়ে চেয়েই জিততে চায়। ও করে কোনদিন কিছু হয়েছে, না হবে?"

"ও ছাড়া আর কোন্ পথ আছে বলুন।"

কালীপদবাবু তার কৃত্রিম ক্রোধের ভাব এবার দ্বিগুণ চড়িয়ে দিয়ে বলেন, "আছে মশায়। সোজা, স্পষ্ট পথ। সব দেশের সব যুগের যা একমাত্র পথ।"

"যথা?" প্রশ্ন করে তাকে উস্কে দিতে চাই।

কালীপদবাবু ফিক্ করে হেসে গরম সুর হঠাৎ নরম করে আনেন, "পথ মশাই যাই হোক না কেন, তাই বলে এমন সব ছিঁচকাঁদুনের মিছিল। হ্যাঁ, মিছিলের মতো মিছিল বার কর একটা, তবে না।"

"কেমন?"

"—এই ধরুন: ট্যাঁকে টাকা আছে, বাজারে কাপড় নেই। সমস্যাটা তো এই? বেশতো পাঁচ টাকার আর দশ টাকার নোট গঁদের আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে এক-একখানা দেড়হাতি গামছা তৈরী করে তা-ই পরে যা না চলে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে লাট সাহেবের বাড়ির কাছে।

দিগম্বর-দিগম্বরীদের সাইলেণ্ট ডেমোষ্ট্রেশন! শ্লোগানের দরকার নেই। দেখেই বুঝবে : টাকা আছে, কাপড় নেই।”

আমি আর অধ্যাপক সলজ্জ বিরক্তি গোপন করে চুপ করে থাকি। ধনঞ্জয়বাবু কিন্তু একটুখানি রসাল লেজুড় জুড়ে দিলেন, “তা করেও কোনো ফল হবে না মশায়। লাট-বেলাটের প্রাসাদে আজকাল যা কেত্তন-গানের ধুম, তাতে দূর থেকে বাইনোকিউলার চোখে লাগিয়ে মনে করবে নব ভারতের নব বৃন্দাবনের যত গোপিনীরা এসেছে।”

উৎসাহিত হয়ে কালীপদবাবু বোধ হয় আরো একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার মতলবে ছিলেন। বাধা পেলেন।

তেতলার ফ্ল্যাটের ধরণীবাবু আমাদের কাছে এসেই সোৎসাহে জানালেন, “শুনেছেন”—

“কী?”

“কাল সকাল সাড়ে আটটায় আমাদের এই রাস্তা দিয়ে গবর্ণর যাবেন—মনোরমা প্রসূতি ভবনের নতুন ওয়ার্ডের উদ্বোধন করতে।”

আমাদের এতদিনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল।

সকালবেলা রকে বসে আমরা খবরের কাগজ পড়ছি। এক পুলিশ কনষ্টেবল এসে দেয়ালের পোষ্টারগুলো ছিঁড়তে লেগেছে। বুঝলাম তার উপরওয়ালার হুকুম। লাটসাহেবের গমন-পথে কোনরূপ অবাঞ্ছিত দৃশ্য থাকলে চলবে না।

হঠাৎ রাস্তার একজন লোক কাছে গিয়ে কনষ্টেবলএর হাত চেপে ধরেছে—তাকে কিছুতেই পোষ্টার ছিঁড়তে দেবে না। প্রথমে গালাগাল, পরক্ষণেই হাতাহাতি, তারপর ধস্তাধস্তি সুরু হয়ে গেল। হৈ-চৈ শুনে জড়ো হল এক ছোটখাটো জনতা।

রোগাটে লোকটাকে কাবু করতে কনষ্টেবলটির বেশী সময় লাগল না। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল থানায়। অদূরে জনতা থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে।

এমন সময় মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। জনতার মধ্য থেকে জন দশেক লোক বাজপাখীর মত কনষ্টেবলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্পষ্ট দেখলাম তাদের মধ্যে আছে রসুল মিঞা, মোড়ের চায়ের দোকানের বয়টি, স্যাকরার দোকানের সেই কানা কর্ম্মচারিটি, 'রমা ফার্মেসি'র বাইরের বারান্দায় আমেরিকান্ লজেঞ্জ-বিস্কুট-চকোলেট বিক্রী করে যে বেঁটে ছোকরা সে-ও এবং আরও জনকয়েক অচেনা অজানা মুখ। বাকী জনতাও টগবগ করছে উত্তেজনায়।

লোকটাকে পুলিশের কবলমুক্ত করে তারা সামনের চৌমাথার দিকে চলল এক বিজয়ী সেনাবাহিনীর মতো।

আমাদের চোখের সামনে চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এমন অনর্থ ঘটবে কে ভেবেছিল।

"গতিক ভালো নয়" বলে অধ্যাপক উঠে দাঁড়ান। আমরা যে যার ঘরে ফিরে যাই। কেন-না থানা বেশী দূরে নয়।

দোতলার ঘরের মধ্যে বসে দেখছি সব। দুই গাড়ী সঙ্গিনধারী পুলিশ এসেছে। নেমেই প্রথমে তারা দেয়ালটা একেবারে সাফ করে দিলে— সিনেমার বিজ্ঞাপনগুলি শুদ্ধ। তারপর দুভাগ হয়ে একভাগ চলে গেল মোড়ের দিকে। ভাবলাম এবার সুরু হবে ধরপাকড় আর খানাতল্লাস।

মিনিট দশেক বাদে। রাস্তার উপর তোলপাড় কাণ্ড। লাট আসছেন। অসম্ভব ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেছে। ঘনঘন হুইসিল্। হটো, হটো : তফাৎ যাও : খাড়া রহো : ঠাড়ো উধার : হটো।

রাস্তার দু'ধারে নিরুদ্ধ নিশ্বাসের মতো থেমে গেছে সব কিছু : চলন্ত গাড়ী, পথচারী, ভিখিরি, বেওয়ারিশ বেড়াল-কুকুর-ষাঁড়—সব। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটি ভয়ঙ্কর মুহূর্তের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে।

এক, দুই, তিন, চার……

নক্ষত্র বেগে বার হয়ে গেল গভর্নরের গাড়ী !

বিকেলে আপিস থেকে বাসায় ঢুকে সিঁড়ির মুখে প্রশ্ন করি গৃহিণীকে, "তোমার ছেলে বাসায় ?"

"হ্যাঁ।"

"আজ কোথাও যায়নি তো ?"

"না গো, স্কুল থেকে সোজা বাড়ী ফিরেছে।"

নিশ্চিন্ত হই।

সন্ধ্যার পর ধনঞ্জয়বাবু তাদের দোতলার বারান্দা থেকে ডাকলেন। আমাদের বারান্দার এক কোনে গিয়ে রেলিঙ-এ ভর করে মুখ বাড়িয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে প্রশ্ন করি, "মহীতোষ ফিরেছে ?"

"না। সে জন্যেই তো ভাবনায় পড়েছি। বলে গেছে, খেলার মাঠে যাচ্ছি। হতভাগাকে এত বলি, তবু রোজ রাত করে বাসায় ফিরবে।"

ওপারে দেয়ালের কাছে একজন কনষ্টেবল মোতায়েন রয়েছে সকাল-বেলার ঘটনাস্থলে। সারারাত পাহারা দেবে নাকি ?

তেমনি অনুচ্চ কণ্ঠে বলি, "মহীতোষকে এলে বলবেন অবজেকৃশনেবল কাগজ-পত্তর কিছু থাকলে আজ রাত্তিরেই সব যেন সরিয়ে ফেলে।"

"না, সে ভয় নেই", ধনঞ্জয়বাবু অভয় দেন, "যত বড় বড় কথা ওর মুখেই।

—আমরাও এককালে বলেছি মশাই। যাক্, আজ থেকে পাড়াটা ঠাণ্ডা হবে আশা করা যায়। শেষ পর্য্যন্ত ক'জন গ্রেপ্তার হল জানেন?"

"সতের জন।"

পরদিন সকালবেলা। যথাসময়ে নিচে যেতেই পরেশবাবু অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বললেন, "দেখছেন তো? রাতরাতি কী কাণ্ড।"

"হুঁ। ভোরবেলা বিছানায় বসেবসেই দেখেছি সব।"

আবার পোষ্টারে পোষ্টারে দেয়ালের গায় কোথাও একটুকু ফাঁক নেই।

"ইঁদুরের রাজত্ব সুরু হল মশায়—ইঁদুরের রাজত্বি!" ধনঞ্জয়বাবু সভয় বিস্ময়ে বললেন, "বীজ ছড়াচ্ছে—সর্বনেশে মহামারীর বীজ!"

অবশ্যম্ভাবী

পাশের অংশে কিছুদিন হল নতুন যে-ভাড়াটে এসেছে, নিঃসন্দেহে তারা ভদ্রলোক নয়। অভিমতটা গৃহিণীর, সুতরাং নগেনবাবুরও।

ওরা প্রথম যে-দিন এল, তার পরদিন রাত্রে স্বামীকে এসে চাপা গলায় সুরমা দেবী জানিয়ে দিলেন, "ওগো, এবারেও সেই—"

"কী ?—আবার বাঙ্গাল ?"

"বাঙ্গাল বলতে বাঙ্গাল ! পাঁড় বাঙ্গাল।"

"মানে ?"

"মানে আবার কী !" সুরমা দুয়ার ভেজিয়ে দিয়ে এসে এবার সহজ-ভাবেই বলেন, "অনেক বাঙ্গালের সঙ্গেই তো এক বাসায় থেকে এলাম, কিন্তু কস্মিনকালে এমন ধারা মেয়েছেলে দেখিনি তো !"

নগেনবাবু জিজ্ঞাসু চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে আছেন এক মুখরোচক সংবাদের আশায়। সুরমা কোষ্ঠি কেটে চললেন, "মেয়ে নয় ত পুরুষের বাবা। রাতদুপুরে একাএকা বাসায় ফেরে কোন্ সাহসে শুনি ?

ছ'ছটো ভাই ত রয়েছে ঘরে, তাদের কাউকে নিয়ে বেরুলেই ত হয়!—বাবা! ভাবতে আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে!"

পরম উৎসাহিত হয়ে নগেনবাবু মন্তব্য করেন, "তাহলে ওদের মেয়েগুলোর চরিত্তির—"

স্বামীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুরমা কিন্তু ফোঁস করে ওঠেন, "ছ্যাখো! তোমার মনে"বড় ময়লা। না জেনে শুনে অমনি সুরু করে দিলে ত!"

"ভাল রে ভাল!" নগেনবাবু নিরাশ হয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এখন মান বাঁচান চাই। কথাটা হালকা করতে চাইলেন, "আমি আবার কখন কী বললাম? তুমিই ত কী সব কথা বল্‌ছ। রাত দুপুরে—"

"রাতদুপুর মানে বুঝি তোমার রাত বারোটা! যেমন বুদ্ধি তোমার!"

নগেনবাবু চুপ করে শুনে যান রাতদুপুরের ব্যাখ্যাটা!

"রাত দশটায়ই বা মেয়েমানুষ একা—এই কলকাতার রাস্তা দিয়ে বাসায় আসে কোন্ আক্কেলে? ভয় ডর নেই?"—সুরমা চটে ওঠেন।

"ভয় পাবে কেন? ওরা ত আর তোমার মত নয়—আজকালকার স্বাধীন জেনানা গো!"

"অমন স্বাধীন জেনানার মুখে আগুন।"—বলেই সুরমা দুয়ার খুলে গৃহকাজে বাইরে চলে যান।

পরদিন আপিসে সহকর্মীদের কাছে নগেনবাবু যতটা জানেন সেই আসল কাহিনীর সঙ্গে অনেকখানি রঙচঙ মাখিয়ে আবহাওয়াটা রসালো করে তুললেন। মাঝে মাঝে থেমে পড়তে হয়—পাশের ঘরের নলিনী ছেলেটা একে ত বাঙ্গাল, তায় আবার গ্র্যাজুয়েট মেয়ে বিয়ে করেছে সম্প্রতি।

"দেখে শুনে তোমার গিন্নীরও হয় ত পাখা গজাবে হে নগেন। সাবধান!" সহাস্যে মন্তব্য করেন বৃদ্ধ রামহরি বাড়ুজ্যে।

"আর বলো না দাদা! ওদের গিন্নী ত লেডী ডাক্তার। বড় মেয়েটা নাকি মাষ্টারনী। দুটো ধাড়ী মেয়ে গড্‌গড্‌ করে কলেজে যায় একা-একা।—তোমাদের কাছ থেকে এতকাল শুনেছি, রাস্তাঘাটে ট্রামেবাসে স্বাধীন জেনানা রোজই ত দু'চারটে কোন আর না দেখি, ব'ল! কিন্তু এ যে পাশের ঘরেই বাঘের বাসা!"

"মেয়েছেলেকে এই বয়সেও এত ভয়, নগেনবাবু!" হেসে ওঠে শ্রীমন্ত—বয়েস তার এখনো কুড়ি পেরোয়নি। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্ম্মীদের মাত্রাহীন রহস্যকৌতুকে যোগ দেবার লাইসেন্স পেয়ে গেছে।

"ভয় পাব না—বল কি হে! ও বুঝি তোমার আমার মত ভেবেছ। এ-দুদিনেই কত ছেলে-ছোক্‌রা এসেচে ভাই, সবই বুঝি আত্মীয়-স্বজন! যত সব ইয়ে—। চিৎকার করে পোলিটিক্যাল তর্ক জুড়ে দেয়। আজ বাজারে বেরুবার সময় দেখি—ওদের জানালার কাছ দিয়েই ত বেরুতে হয়—সেই মাষ্টারনী মেয়েটা এক মনে বসে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছে। বাজার থেকে ফিরেও দেখি, ঠিক তেমনি চুপ করে বসে কাগজ পড়ছে।—খবরের কাগজগুলোয় এমন কী থাকে হে?—ঘণ্টা খানিক তাই নিয়েই পড়ে থাকতে হবে!"

"স্বদেশী টদেশী নয় ত ভায়া?"—বৃদ্ধ রামহরি প্রশ্ন করেন।

"কী জানি দাদা!—ওদের অসম্ভব কিছুই নেই!" নগেনবাবুর কণ্ঠস্বরে এবার শঙ্কার আভাষ পাওয়া যায়।

পরদিন রাত্রে।

সুরমা জানালেন, "আর যাই বলো না, একটা বিষয়ে কিন্তু ওদের প্রশংসা করতেই হবে!"

"কিসের?"

"ওদের কত্তা মারা যাবার পর যে অকূলে পড়েছিল ওরা তা যদি শোন। —ভদ্রলোক একটা ইন্‌সিওর পর্য্যন্ত রেখে যান নি। গিন্নী রোজগারে না বেরুলে সকল গোষ্ঠি এদ্দিনে না খেয়ে শুকিয়ে মরতো।"

"হ্যাঁ! ছেলেপেলে রেখে এ দুনিয়ায় কেউ যেন কোনদিন মরেনি! আর তারা সব না খেয়ে শুকিয়েই মরছে কিনা!"

"না খেয়ে মরবে কেন! মণি মাসিমার মত ভাসুরের সংসারে লাথি ঝাঁটা খেয়ে দু'বেলা দুটো মুখে গুঁজত হয়তো।"

"এরি মধ্যে বাতাস লেগেছে বুঝি!" নগেনবাবু বক্র কটাক্ষ করলেন।

সুরমা কথাটা গায়ে মাখেন না। বলেই চললেন, "বড় মেয়েটা বিয়ে করছে না বুঝি সাধে। ছেলেদুটো আর বীণার পড়ার খরচা তো বরাবর সেই চালিয়ে আসছে গো! কী চমৎকার মেয়ে। আমি ত ভেবেছিলাম, পেটে অত বিদ্যে—আমাদের মতন মুক্ষুসুক্কুর সঙ্গে বুঝি কথাই কইবে না।"

"অ্যাঃ। বড্ড যে স্বাধীন জেনানা ভক্ত হয়ে উঠ্‌ছ, দেখ্‌ছি! আর কি! কাল থেকে সারাক্ষণ খবরের কাগজ নিয়ে বসে থেক, হেঁসেলে ঢুকব আমিই।" নগেনবাবুর শ্লেষটা এবার রসিকতার ছোঁয়ায় একটু হালকা হয়ে এল।

"তোমার ত অমনি কথা! কত শুনেছি, লেখা-পড়া জানা মেয়েরা রাতদিন বই নিয়ে পড়ে থাকে, হাতা-খুন্তি ধরতে চায় না, লঘু গুরু জ্ঞান নেই।" বলতে বলতে সুরমার কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, "ওদের ক'টা ঠাকুরচাকর রয়েছে, শুনি? মেয়েগুলো রেঁধেবেড়ে বাসন-

কোশন মেজেঘসে সব দিক গুছিয়ে তবে ত সব যার যার কাজে বেরয়। একটা ঠিকে-ঝি পর্য্যন্ত রাখে নি।—পালা মত গিন্নীকেও তিনদিন পর ছুবেলা হেঁসেলে যেতে হয় গো।"

"তাই নাকি ?"

"তবে !"—সুরমা কথাটা বললেম কেমন এক গর্ব্বিত অনুভূতি নিয়ে।

"তা—যাই বলো," নগেনবাবু আমতা আমতা করতে থাকেন, "বেশি মেলামেশা ভাল নয়। তেলে জলে মিশ খাবে না।"

"আমি আবার কী মিশতে গেলাম। বিকেলে একবার শুধু গিয়েছি—এক বাড়ীতে থাকলে যেন না গিয়ে পারা যায় !—রাতদিন ওদের ওখানে পড়ে থাকে ত তোমার মেয়েই। ডেকে ডেকে সাড়া পাই না ! মেয়েটাকে দিয়ে কুটো ছিঁড়ে দু'খানা করবার উপকারটুকু পাই নে বাবা !" সুরমা দেবী অমনি সুরু করলেন পাশের ঘুমন্ত মেয়েটার উপর তার অভিযোগের পালা।

"টুনিকে আমি কাল বারণ করে দেব। এই বয়েস থেকে দেখে শুনে কুশিক্ষা পেলে আর রক্ষে আছে !—যে দিনকাল ! কাল লেকের জলে একটা ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে ডুবে মরেছে, শুনেছ ?"

যেন লেখাপড়া শিখলেই মেয়েগুলো সব লেকের জলে ডুবে মরে এমনি ভাব দেখিয়ে নগেনবাবু স্ত্রীকে পরিষ্কার করে নারীত্বের মহিমা বোঝাতে সুরু করলেন, "হ্যাঁ—লেখাপড়া মেয়েরা একটুআধটু করবে বৈ কি ! তোমরাও তো মানুষ ! তবে সন্তানের মা হবে যারা, তাদের শিক্ষা ছেলেদের মত হলে চলবে কেন ! শত হলেও মেয়ে-মানুষ মেয়েমানুষই—পুরুষ নয়। কী বলো ? এই—ধরো চিঠিপত্রটা লিখতে পারে, ইংরেজিতে ঠিকানা লেখা খামের চিঠি এলে বুঝতে পারে কার চিঠি—ব্যস ! এই তো যথেষ্ট।"

"তাতে ত আর চাকরি করবার বিদ্যে হয় না।"—সুরমা সহাস্যে অভিমত জানান।

"মেয়েরা চাকরি করবে কোন্ দুঃখে শুনি?" বলেই নগেনবাবু চাকুরী করার কত সুখ তাই স্ত্রীকে সবিস্তারে বলে চললেন, "মাষ্টারি আর কদ্দিন করবে মেয়েরা?—কটাই বা মেয়ে ইস্কুল রয়েছে? যাক্, না আপিসে সব, বুঝবে মজাটা। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা অবধি কলম পিশে এসে টের পাবে, কত ধানে কত চাল।—"

"আর আমরা যেন ঘরে বসে বসে খাই—খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মরি।"

"তোমরাও খাটো—রাতদিন কাজ কর, তা মানি। কিন্তু তোমাদের অত কাজের মধ্যেও সুখ আছে, তা জান?" নগেনবাবু জনসভার বক্তার মতই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন,—'ভাত রাঁধছ, বাট্না বাটছ, কোটনা কুট্‌ছ, ঘর ঝাঁট দিচ্ছ, বিছানা করছ, কাপড় জামায় সাবান মাখাচ্ছো।—সব সময়ই তোমাদের কাজের মধ্যে এই কথাটাই থেকে যায় "আমার বাসন-কোশন, আমার ছেলেমেয়ের খাবার, আমার স্বামীর কাপড়-জামা, আমাদের শোবার বিছানা—একটা আমিত্ব থাকে বলে কাজটা তোমাদের কত হালকা, তাই নয়? আর আমাদের? দৈনিক আট ন'ঘণ্টা ত খাটি—প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়ঃ এ সব আমার নয়। এ কাজ আমার নয়—সব ঐ বংশীলাল ঝুন্‌ঝুনওয়ালার। এর লাভ, এর ফল সব যাবে ব্যাটাচ্ছেলের পিপের মত ঐ বিশাল ভুঁড়ির মধ্যে! যাও না গো একদিন মার্চ্চেন্ট আপিসের কেরাণী হয়ে এস গো—বুঝবে ঠেলা!"

স্বামীর এই অকাট্য যুক্তির কাছে স্ত্রী যেন বোকা বনে যায়। সোনার খাঁচার পোষ-মানা পাখী আজ একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মাত্র। আবার অভ্যস্ত মন প্রকৃতিস্থ হয়। সুরমা দেবী মনে মনে তাঁর অত

লেখাপড়া জানা স্বামীর কথায় সায় না দিয়ে পারেন না। ওদের লজ্জা-সরম সত্যি বড় কম। মেয়েমানুষ অমন হলে যেন ভাল দেখায়!—না, তা মানায়? রাত দশটায় টিউশন করে একা একা বাসায় ফেরে! বাবা! ভাবতে গেলে সুরমার বুক টিপ্‌টিপ্‌ করে। কলকাতার রাস্তায় কত গুণ্ডা আর বদমাইশ হেঁটে বেড়ায়! এই ত সেদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল……

মাস দুই পরে।

কর্ত্তা আর গৃহিণীর মধ্যে ইদানীং দিনে রাতে অমন পঞ্চাশ বার ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। নগেনবাবু এই সুদীর্ঘ কাল পরে সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, স্ত্রী তাঁর একটা অকম্মার ঢেঁকি! হাঁড়ি ঠেলে, খায় দায়, চুল বাঁধে আর গল্প করে। সুরমা দেবীও এতদিনে বুঝতে পেরেছেন, লোকটা পুলিশের দারোগা হলেই তাঁকে মানাত ভাল—স্ত্রী যেন তাঁর কাছে দশধারার আসামী আর কি!

নগেনবাবু বাইরের ঘরটা বেশ সাজিয়েছেন। গোটা কয়েক চেয়ার, একটা গোল টেবিল, দুটো বেতের ইজিচেয়ার আর ডজন খানিক বাঁধানো ল্যাণ্ডস্কেপের ভীড়ে ছোট্ট ঘরটা যেন রাতদিন হাঁপায়। আজকাল সকাল বেলা বাইরের ঘরে বসেই চা খান আর ঘণ্টা দেড়েক বসে খবরের কাগজ পড়েন।

এর চেয়েও বিস্ময়ের কথা, আজকাল নগেনবাবু পাশের অংশের কোন প্রসঙ্গ উঠলেই খুসী হয়ে ওঠেন। গৃহিণী তা সইতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গেই তিলকে তাল করে জানিয়ে দেন—ওরা কত বড় নির্লজ্জ, কি রকম ছোট মন তাদের, জাত মানে না, কাঠ মানে না—ঘরের পাশে

কি যে সব অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ডকারখানা হচ্ছে রাতদিন, তা শুধু জানেন ভগবান আর জানেন সুরমা দেবী !

তার চেয়েও ঢের বেশী আশ্চর্য্য, ওদের অমন নিন্দুক সুরমা মেয়েকে স্কুলে দেবার জন্যে আজকাল যেন একেবারে খেপে উঠেছেন। আর সর্ব্বাধিক বিস্ময়ের কথা এই যে, ও-বাসার এমন সপ্রশংস সমালোচক নগেনবাবু মেয়েকে ভর্ত্তি করার কথা শুনলেই গৃহিণীকে কেবলি নিরস্ত করেন। বক্তৃতা সুরু করে দেন, "কেন, ঘরে বসে বুঝি পড়াশুনা হয় না? মেয়েছেলে একটুআধটু লিখতে পড়তে শিখবে, তার জন্যে আবার স্কুল-কলেজ কেন? তোমার মেয়ে যা শিখেছে এরি মধ্যে তাই যথেষ্ট। আবার কী!"

সুরমা পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, "তুমি একেবারে চোখ বুজে আজ —ভবিষ্যতের কথাটা একবার ভাব? মেয়েকে বুঝি বিয়ে দিতে হবে না?"

"তোমার যেন আর বিয়ে হয়নি!" সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা জবাব দেন নগেন-বাবু, "তোমায় নিয়ে বুঝি আমি ঘর করি নি এদ্দিন? আমাদের মা-ঠাকুরমারা যেন চিরকাল আইবুড়ো হয়েই ছিলেন!"

সুরমা মনে মনে খুশী হয়েও কি জানি কেন জেদ ছাড়তে চান না, "সেকাল আর একাল যেন এক!—যখন যেমন তখন তেমন।"

"মেয়েমানুষ সব কালেই এক।"

সুরমা দেবী রেগে যান, "মেয়েদের তোমরা শেয়াল-কুকুরের মত মনে করে এসেছ এতকাল, আর তা চলবে না।"

গৃহিণী এই নতুন বুলি যেখান থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন নগেনবাবু অমনি সেখানকারই প্রসঙ্গ তুলে নিজেরই অজানতে মুখর হয়ে ওঠেন। দেখতে দেখতে সুরমার সুর কেটে যায়, তাল ভঙ্গ হয়।......ওদের

গৃহিণীর অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়! মেয়েগুলোর উপর একটু কড়া শাসন রাখলে কি তারা এমন যখন তখন বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারে! ইত্যাকার অনেক অভিযোগ একসঙ্গে এসে জমা হয়। মেয়ের পড়া আর নারীর মুক্তি ধামাচাপা পড়ে যায়।

সেদিন আপিস থেকে ফিরতেই মেয়ে এসে বাপকে শক্ত করে ধরে, "বাবা! আমি ইস্কুলে ভর্ত্তি হব।"

"কেন?"

"বা রে! ইস্কুলে না গেলে বুঝি কারু বিদ্যে হয়!"

"অত বিদ্যে দিয়ে কাজ নেই মা লক্ষ্মীটি। ঘরে বসে যা হয় তা-ই ভাল!"

সুরমা ফোড়ন কাটেন, "দশটা নয়, পাঁচটা নয়—একটা মাত্তর মেয়ে। তার ইস্কুলের খরচায় তুমি ভয় পাও।"

"হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছি—তবে খরচের কথা ভেবে নয়। কী যে সব ব্যাপার হচ্ছে দিনের দিন তা তো আর জান না। খবরের কাগজে বুঝি সব কথা বেরোয়! আর, মেয়েরা স্কুল-কলেজে গিয়ে যা শিখবে কোন্ কাজে লাগবে তা শুনি? রান্না করা, ছেলেপেলে মানুষ করা, আচার-নিষ্ঠা, ব্রত-পার্ব্বণ, সেবাশুশ্রূষা—এ-সব শিক্ষা ঘরের চেয়ে ভাল করে শেখাতে পারে কোন্ স্কুল-কলেজ নাম করো! তুমি যদি নিজে মেয়েকে ও-সব না শেখাতে পার, সে-দোষ তোমার।"

"হয়েছে! থামো এবার। সবতাতেই তোমার ঐ এক কথা—কেবল বক্তিতা। বড্ড সেকেলে মন তোমার।" সুরমা কথাগুলো বললেন কৌতুক ভরেই। কিন্তু নগেনবাবু হঠাৎ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, —ভালমন্দ না জেনে পরের মুখের ঝাল খেতে খুব শিখেছ যা হক্। কালই বাড়ি খুঁজতে বেরবো! আর এখানে থাকা চলবে না।"

খণ্ড প্রলয়টা সহসা চাপা পড়ে এক অপ্রত্যাশিত বাধায়। নগেনবাবুকে অবাক করে দিয়ে ঘরে ঢোকে সেই মাষ্টারণী মেয়েটা, অর্থাৎ মিস্ প্রতিভা দত্ত।

"মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে আপনার আপত্তির কারণটা শুনতে পারি ?"

নগেনবাবু এখনো বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আগেভাগে নোটিশ না দিয়ে হঠাৎ এসে মেয়েটি সরাসরি এমন প্রশ্ন করে বসবে সে-কথা তিনি ভাবতেই পারেন নি।

"আপনি কি মেয়েদের লেখাপড়া পছন্দ করেন না ?"

"না-না, তা ঠিক নয়।" নগেনবাবু আমতা আমতা করতে থাকেন, "আপনি ভুল শুনেছেন। তবে কি জানেন—এই, আরো কিছুদিন পড়ুক না বাড়ীতে, তারপর—আপনাকে কেউ ভুল বুঝিয়ে থাকবে। মানে—"

"আপনার কোন আপত্তি শুনব না কিন্তু," মিস্ দত্ত মিষ্টি করে হেসে উঠে। "টুনির মাকে শুদ্ধ স্কুলে পাঠাব শেষকালে !"

মেয়েটা চলে গেল। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত আর কি ! নগেনবাবু সলজ্জ বিস্ময়ের ভাবটা সামলে নিয়েছেন এতক্ষণে। স্ত্রীর কথা এক বর্ণ মিথ্যা নয়। লজ্জা বলে মেয়েদের যে একটা ভূষণ আছে তা এদের ত্রিসীমানায় নেই। এ ক'মাসে নগেনবাবুর সঙ্গে ওদের কোন পরিচয় ঘটেনি। এতটুকু কথাবার্তা হয়নি কোনদিন—শুধু সামনা-সামনি দেখা হয় মাঝে মাঝে। তাতেই একজন পর পুরুষের কাছে সটান এসে হাজির—শুধু হাজির নয়, যেন তার খাস তালুকের প্রজা নগেনবাবু—এমনি তার কথা বলার ঢং ! এদের কথায়, এদের সভ্যতা শিখতে, নগেনবাবু তার মেয়েকে পাঠাবেন স্কুলে ? প্রাণ গেলেও না।

সুরমা দেবীও বিরক্ত হয়েছেন অপরিসীম। বলা নেই, কওয়া নেই, স্বামী-স্ত্রীর কথার মধ্যে পাশের ঘর থেকে মেয়েটা ফস্ করে এ ঘরে ঢুকল কোন আক্কেলে! আর তার কথা বলার ছিরি দেখে সুরমার গা রি-রি করে। অপরিচিত এক পর পুরুষের সঙ্গে নাকি কোন মেয়ে এমন করে গায়ে পড়ে এসে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করে। যেন কত কালের পরিচয়—এমনি মাথামাথি ভাব দেখালে মেয়েটা। বেহায়ার বেহদ্দ!

"দেখলে ত!" সুরমা দেবী বললেন, "কী বেহায়া মেয়েমানুষ!"

নগেনবাবু জবাব দেন না। শুধু সহাস্য চোখে চেয়ে রইলেন স্ত্রীর মুখের দিকে। তার মনে এখন বিদ্রূপ না বিস্ময়, নিন্দা না প্রশংসা, সমর্থন না সমালোচনা, তা সঠিক বলা শক্ত।

এতদিনে একটি আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ের খানিক পরিচয় পেলেন। আর কিছু না-ই বা জানলেন, এইটুকু কিন্তু বেশ বুঝে নিয়েছেন—ওরা ডাইনীও নয়, মায়াবীও নয়, বাঘিনীও নয়। সুরমাব মতই এক প্রাণী—তবে সুরমার মত মনটা বদ্ধ এক স্বচ্ছ সরোবর নয়—যেন নদী, একস্থানে স্থির হয়ে নেই—সচল, সতেজ, বলিষ্ঠ।

আরো মাস কয়েক পরে।

শনিবারের বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে নগেনবাবু বললেন, "সুরু, চল আজ সিনেমায় যাই?"

"খুকী আজ মাসীমার ওখানে গেছে যে—আসবে সেই রাত্তিরে। ওকে ফেলে বায়স্কোপে গেছি শুনলে মেয়ে বুঝি রক্ষা রাখবে আমার।"

"খুকী আজ নেই বলেই তো বলছি গো!—আমরা দুজনে শুধু যাব—

ওপরে মেয়েদের ওখানে কিন্তু আজ বসতে পারবে না, আমার সঙ্গে নিচেই থাকবে।"

"সে কি !"

"কেন, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে ?"

"তা নয়—তবে," সুরমা থেমে যান কী যেন বলতে গিয়ে।

"বল না তোমার আপত্তি তবে কিসের।"

"পুরুষদের সীটে গিয়ে বসব না আর কিছু" বলেই সুরমা অভিমানের সুরে জানালেন, "বাইরে বেরুবার মত তোমাদের বাড়ীর ব্যবস্থা আছে কিনা !"

"কেন. তোমার শাড়ি-ব্লাউজের অভাব আছে নাকি ?"

"শাড়ি-ব্লাউজ হলেই যেন হল ! বসব গিয়ে পুরুষদের ঘরে, আর—"

সুরমা দেবী থামলেন। নগেনবাবু বুঝে নিয়েছেন, আসল আপত্তিটা কী। হেসে ফেললেন, "সে ব্যবস্থাও করে এনেছি, এই ছাখো," বলেই চৌকির তলা থেকে কাগজে-জড়ান এক জোড়া জুতো বার করলেন। "আন্দাজে এনেছি, পায় দিয়ে ছাখতো, ঠিক মাপ মত হল কিনা !"

সুরমা খুশী হলেন অপরিসীম। মুখে বললেন, "হুঁ, এই বুড়ো বয়সে জুতো পরতে যাব কিনা ! তোমার মত—"

"ওঠ, আর দেরি করো না। চুল বেঁধে কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও। তিনমাস ধরে 'চিত্রায়' একটানা এই বইখানা দেখাচ্ছে। কী চমৎকার ছবি। আমাদের আপিসের সবাই দেখেছে।"

"কী নাম ছবির ?"

"স্বাধীনতা—অভিরাম সাহার ডিরেকশান্, 'প্লে' করেছে ভবানী ভঞ্জ আর বেহুলাবালা।"

"বেহুলাবালা ?"

"হ্যাঁ। গল্প লেখা কার জান? অবনী সোমের। মস্ত বড় সাহিত্যিক।"

সাহিত্য বা সাহিত্যিক নিয়ে কোন কালেই মাথা ঘামাবার বালাই নেই সুরমা দেবীর। তিনি খুসী বেহুলাবালা নেমেছেন তাই জেনেই। নগেনবাবু সোৎসাহে বলেই চলেন, "অবনী সোম একখানা বেড়ে প্লট দিয়েছেন বটে। আলট্রা মডার্ণ মেয়েগুলোর মাথায় মেরেছেন এক আচ্ছা চাঁটি! চমৎকার করে দেখিয়েছেন, মেয়েরা ঘরে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—বাইরে যাবার পাখা গজালেই যত অনর্থের সৃষ্টি হয়! আমাদের যতীনবাবু কাল দেখে এসেছেন। বললেন, শেষের দিকটায় চোখের জল আর চেপে রাখা যায় না। মেয়েটার সে কী কান্না। স্ত্রীর স্বাধীনতার ঠেলায় স্বামী রাগ করে সেই যে চলে গেল আসামের কোন এক জঙ্গলে আর দুজনের দেখা নেই। দেখা হল যখন, ছেলেটির তখন শেষ সময়। ঐ স্বামীত্যাগিনী মেয়েটাকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে ছোরার আঘাতে ছোঁড়াটা কিনা অকালে প্রাণ দিলে! একেই বলে আর্ট! অবনী সোমের কলম আর অভিরাম সাহার ব্রেন!"

গল্পের প্লট শুনবার জন্য সুরমা উদ্‌গ্রীব নন আদৌ। তিনি এখন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে চান।

"—স্ত্রীর কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নেই, স্বামীর ইচ্ছা স্বামীর আদর্শই স্ত্রীর আদর্শ। এই ছিল ভারতের সনাতন প্রথা—সীতা সাবিত্রী বেহুলার কথা। কথাটা বলতে বলতে অভিরাম সাহা নাকি এমন একখানা পোজ দেখিয়েছেন, যা বাংলা ছবি, তো বাংলা ছবি ইংরেজি বইতেও খুব কমই চোখে পড়ে!"

"আঃ! সবটা আগেই বলে ফেলছ যে!" আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে খোঁপা তুলতে তুলতে সুরমা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন।

"ওরিয়েণ্টাল মুভি কোম্পানী আজকাল সত্যি খুব ভালো ছবি তুলছেন বাঙ্গালী কোম্পানী কিনা! টেষ্ট আছে তো! ওরা নাকি পর পর এমন সব সামাজিক ছবি তুলবেন যাতে দেশের সত্যিকার উপকার হয়। "স্বাধীনতা"ই তাদের প্রথম ভেঞ্চার!—অবনী সোমকে পেয়েছে ওরা। কী চমৎকার আইডিয়া লোকটার," বলেই নগেনবাবু যেন স্বগত ভাবেই আবৃত্তি করেন, "কিপলিং সাহেব কি আর সাধে বলেছেন—দি ইষ্ট ইজ ইষ্ট, ওয়েষ্ট ইজ ওয়েষ্ট—টোয়েন স্থাল নেভার মিট। আমাদের মেয়েরা মেম সাহেব বনে গেলে হবে এক কিম্ভূতকিমাকার জীব!—না এদেশের না, ওদেশের।"

সুরমা চুল বেঁধে কাপড় পরে নতুন জুতাজোড়াও পায় দিয়ে তৈরী হয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ঘরের বাইরে এসেই কেমন এক লজ্জায় তার সর্ব্বাঙ্গ যেন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। ভাগ্যিস্ ওঘরের ওরা আজ কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছে! নইলে যতক্ষণ দৃষ্টির আড়ালে না যেতেন সকলে মিলে নিঃসন্দেহে সুরমা দেবীর চলনের দিকে তাকিয়ে থাকতো! রাস্তায় যেতে যেতে—বাসা থেকে ট্রাম রাস্তা পর্য্যন্ত এই পাঁচ মিনিটের পথের মধ্যে—সুরমা বার বার ভাবেন—চলাটা ঠিক হচ্ছে তো, এমনি করেই বোধ হয় পা ফেলতে হয়, ঘোমটা আর একটু টানাই ভালো—কী জানি পরিচিত আত্মীয়স্বজনদের কে কখন সামনে পড়ে যায়, খুকীকে ছেড়ে ছবি দেখতে যাওয়া বোধ হয় ভালো হল না, এক ঘর পুরুষের মধ্যে কেমন করে অতক্ষণ বসে থাকবেন—মা গো!

"ও কী!"

"কিচ্ছু না।" সুরমা দেবী আসল কথাটা কিন্তু চেপে যান। বড় রাস্তায় পড়বার আগেই দু' পায়ে আঙ্গুলে ফোস্কা পড়ে গেছে। উঃ! বড্ড লাগে যে। তবু মানের দায়ে মুখ ফুটে স্বামীকে কিছু বললেন না।

কী কুক্ষণেই নগেনবাবু আজ স্ত্রীকে নিয়ে বার হয়েছিলেন। সুরমা যে এমন কেলেঙ্কারী করে বসবে তা জানা থাকলে কি আর তিনি এমন আহাম্মকের মত কাজ করতেন।

সুরমা বাস থেকে নামতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অতি কষ্টে অডিটোরিয়মে ঢুকলেন যা হক্ করে। তারপর সেই যে মাথা গুঁজে বসে রইলেন আর মুখশুদ্ধ রা নেই তার। চারিদিকে লোক করে গিশ্ গিশ্। সিগারেট খায়, পান চিবোয, গল্প করে, হাস্যকৌতুকে মেতে ওঠে—কী অস্বস্তিকর আবহাওয়া।

নগেনবাবু ছবি দেখতে দেখতে স্ত্রীকে কতবার কত মন্তব্য জানাতে চেয়েছেন. কিন্তু কা-কস্য পরিবেদনা। সুরমা ছবি ভালো করে দেখেছেন কিনা সে সম্বন্ধে নগেনবাবুর ঘোরতর সন্দেহ। তাঁর দুটো টাকা আজ খামকা জলে গেল।

ফিরবার সময় বার দুই হোঁচট খেয়ে সুরমা দেবী কোন রকমে বাসে উঠলেন। বৌবাজারের মোড়ে নেমে আর তিনি চলতে পারেন না। অসহ্য ব্যথা। আর না। জুতো জোড়া খুলে এক সকরুণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জুতো নিলেন হাতে। রাগে দুঃখে নগেনবাবুর সর্ব্বাঙ্গ বিষিয়ে উঠল।—আর ইদিকে যত রাজ্যের পরিচিত লোকগুলোর সঙ্গে আজ দেখা না হলেই হত না যেন। ‘চিত্রায়’ দেখা সুরেশের সঙ্গে—সস্ত্রীক এসেছে, বৌটি বেশ চটপটে, জুতো পায়ে গডগড করে হাঁটে। বাসের মধ্যে দেখা তো দেখা হরিহর চাটুজ্জের সঙ্গে। আর এই বাসায় ঢুকবার মুখটায় কিনা পাড়ার তারিণী সরকারের সকৌতুক দৃষ্টিতে পড়লো পাদুকা হস্তা সুরমা দেবী। ছি ছি!

বড় রাস্তা থেকেই নগেনবাবু স্ত্রীর উপর গজ গজ করতে করতে এসেছেন। সুরমা দেবী সকল কথা সকল ব্যথা এতক্ষণ চেপে

রেখেছেন বাধ্য হয়েই। বাসায় ফিরে ঘরে ঢুকেই একটা বোমার মতো ফেটে পড়লেন। কেঁদে কেটে একাকার কাণ্ড। পাশের ঘরের ওরা এখনো ফেরে নি। টুনিও না। এই কেলেঙ্কারি খালি বাড়ীতে উপভোগ করলো শুধু ভৃত্য নরহরি।

সারারাত স্বামী স্ত্রী কারুর মুখেই কথা নেই। অভিমানে দুজনে দুমুখো হয়ে রইলেন। নগেনবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন যথা সময়েই। সুরমার কিন্তু ভালো ঘুম হয়নি রাত্রে—পায়ের ব্যাথা আর অপমানের জ্বালায় বিছানায় কত বার যে এপাশ ওপাশ করছেন তার ইয়ত্তা নেই।

পরদিন সকাল থেকেও কোন পক্ষে কথা নেই। টুনি ঘুম থেকে উঠে কিছু খেয়ে ওদের ঘরে গেছে—বেলার সঙ্গে বসে তার দিদির কাছ থেকে পড়া জেনে নিতে।

সুরমা ঘরে ঢোকেন। চোখ দুটি ফোলা ফোলা। বোধহয় আজ সকালেও আর এক পালা কেঁদেছেন। নগেনবাবুর এবার মায়া হয়। কাল অত শক্ত কথা না বলাই উচিত ছিল। 'বুনো', 'জংলী', 'ইডিয়ট', 'লিভিং লাগেজ'—এ সব বিশেষণ আরো মিষ্টি করে বললেও চলতো। আর ফোস্কাটা বছর দশেক আগে কেন পড়ল না—পায়ে এবং মনে, ঠিক কালকের মত। জীবনের হিসাবে মস্ত একটা গরমিল হয়ে গেছে আগাগোড়া!

রান্নাঘরের কাছে প্রতিভার গলার আওয়াজ পেয়ে নগেনবাবু কান খাড়া করে রাখেন।

"ও মাসীমা! টুনিকে ইস্কুলে দেবার কী মত ঠিক করলেন?" রান্নাঘরের ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই।

"কথা বলছেন না যে?"

"আমি তার কি জানি মা!" অভিমানে ভারাক্রান্ত সুরমার কণ্ঠস্বর,

"আমি মেয়ে মানুষ, আমার আবার মেয়েই বা কি, ছেলেই বা কি। যাঁর মেয়ে তাঁর ইচ্ছাটা তো আর আমি বলতে পারি নে।"
"কেন টুনীর বাবার মত নেই? কিসের আপত্তি এত?" সুরমা নির্ব্বাক।
"তিনি নিজেও তো শিক্ষিত," নগেনবাবুকে শুনিয়েই কথাটা বলা হচ্ছে, "তাহলে কি বলতে চান তিনি—"
"আমি কিছু বলতে চাইনে, মিস্ দত্ত", বলে নগেনবাবু সহাস্যে বারান্দায় এসে আত্মপ্রকাশ করেন, "আপনি ভুল শুনেছেন—ভুল বুঝেছেন আমায়। —বেশ তো, কালই ওকে ইস্কুলে ভরতি করে দিন্ না, আপনাদেরই ইস্কুলে! আমার কোনো আপত্তি নেই।"
মিস্ দত্ত হাসিমুখে ফিরে যাচ্ছিলেন, নগেনবাবু ডাকলেন "শুনুন।"
প্রতিভা ফিরে দাঁড়ায়!
"আর একটা কাজ করতে পারেন?"
"কী বলুন না।"
"প্রাপ্তবয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিয়ে কী সব বার হয় বাংলা খবরের কাগজে, সে কি সত্যি?"
"না।"
নগেনবাবু সকৌতুকে বলে যান, "তাহলে সে রকম একটা ক্যাম্পেন আরম্ভ করুন না—অবশ্য, প্রথমেই বাড়ীতে হাত পাকিয়ে নেবেন। বেশি বেগ পেতে হবে না। বর্ণপরিচয় আর কথামালা দিয়ে সুরু করার পরিশ্রমটা আপনার বেঁচে যাবে। তারপর থেকে সুরু করলেই হবে। কী বলুন?"
প্রতিভা হাসতে হাসতে চলে গেল। হাসতে হাসতে ফিরে এলেন নগেনবাবুও।…আর হয় না! অসম্ভব!

টুনি খবর শুনে আনন্দে যেন লাফাতে লাফাতে এসে হাজির হল বাবার কাছে।······

সুরমার আর না-ই বা হল। সগর্ব্ব দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে নগেনবাবু এক পরম সান্ত্বনার নিঃশ্বাস ফেলে ভাবেন, মায়েরই তো মেয়ে!

বান্দনী

স্ত্রী যে অসতী এ-কথা গ্রামের সকলেই জানে—জানেন না কেবল স্বামীই। অথবা, হয় তো বা, ভোলানাথ রায়ও সব কথাই জানেন। বোবার শত্রু নেই তাই চুপ করে আছেন। সারা গ্রামের মৌচাকে একবার ঢিল ছুঁড়লে কি আর রক্ষে থাকবে! তাতে কেবল পৌরুষ দেখানোই যায়, কোনো লাভ হয় না। আর, ভোলানাথ রায় আঘাত সুরু করবেন কোন্‌খানে? গোটা দেবানন্দপুরই যে সুলতার কল্পিত অসতীত্বে সরগরম!

ঐ রায়-বাড়ীরই দীঘির ঘাটে বিতর্কের তুফান ওঠে। এক কালের বালবিধবা সৌদামিনী আজ পঞ্চাশোর্দ্ধে ভাঙ্গা গালে মুষ্টিবদ্ধ ডান-হাতখানি রেখে চোখ কপালে তোলেন, "যাই বলিস্ সরু, লোকটার ধৈর্য্যের বলিহারি। ত্রি-ভুবনের কাক-প্রাণীরও জানতে বাকী নেই। আর লোকটা কি না কুঁটো ছিঁড়ে একটু হাঁচিও দেয় না। বাবা!"

যতীন ঘোষের তেইশ বছরের এখনো "ষোড়শী" অনূঢ়া কন্যা সরযু ঠোঁট উল্টে মন্তব্য জানায়, "কিছু বলবে দূরে থাক্, বৌ-এর একটু শরীর

খারাপ হলে সারা বাড়ীটা মাথায় করে তোলেন। দেখলে না সেদিন, বৌ-র ফিট হতে না হতেই—ওরে লালু শিগ্‌গির আয়, জল আন, পাখা আন, ও-ঘর থেকে ব্লাটিন কাগজ নিয়ে আয়—জোরে জোরে বাতাস কর মণির মা! যা-ই বলো না পিসি, বৌকে ভোলাকাকা কিন্তু এখনো ভালবাসেন।"

"অমন ভালবাসার মুখে আগুন", কুমারী ও বিধবার অনুচ্চ উৎসাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সধবা মনোরমা মুখ ঝাম্‌টা দেন,—"ভালবাসা না হাতী! বেচারা ভয়ে টু-শব্দ করে না—যে দজ্জালা মেয়ে!—ফিটের ব্যামো না আরো কিছু!—যত সব ছেনালি।"

চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে পুরুষদেরও বৈঠক বসে। যতীন ঘোষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, "ওর কাছ থেকে দুশো টাকা দেনা করে আটকে আছি ভাই। নইলে একবার দেখিয়ে দিতাম, গাঁয়ের মধ্যে এ-সব অনাচার কেমন করে চলে!"

"বৌটা নাকি মাঝে মাঝে আবার ভিমৃরি দেয়", ফোড়ন কাটে ন'কড়ি হালদার।

"ভোলানাথ ভাই পুরুষ জাতের নাম হাসালে", আর একজন সকৌতুকে মন্তব্য করেন।

আর একজন সহাস্যে যোগ দেন, "বৌর আঁচল ধরে বসে থেকেও তো ধরে রাখতে পারছে না হে।"

"স্ত্রৈণ!"

"বেকুব্!"

"হ্যাঙলা!"

"বৌ-চাটা!"

কথার পিঠে কথা—মন্তব্যের পর মন্তব্য। সকলে মিলে সবচেয়ে বেশি

মুণ্ডপাত করে সুলতার! 'বেহায়া', 'বেজাত', 'বজ্জাত মাগী'—যার যা খুশী তাই বলে। কিন্তু ভোলানাথের মুখের উপর দুকথা শুনিয়ে দেবে এত বড় বুকের পাটা কারু নেই। ভোলানাথের জোতজমি আছে, টাকাকড়ি আছে, লেখাপড়া জানে, এ তল্লাটে তার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। তাই রায় পরিবারের বিরুদ্ধে চলেছে আড়ালে আবডালে গেরিলা যুদ্ধ।

যাকে নিয়ে এত সব রসালো শাঁসালো ধারালো কথার ছড়াছড়ি সেই সুলতা দেবী রান্নাঘরে উনুনের কাছে বসে আছেন তো বসেই আছেন— কতক্ষণ কে জানে।

এক সময়ে ও-ঘর থেকে উঠে এসে ভোলানাথ ডাকেন, "সুলু!"

কোনো সাড়া নেই।

"তোমার রান্নাবান্না তো সব হয়ে গেছে দেখছি।"

জবাব নেই।

"শুনছ? ওঠো এবার। খেতে দাও। তোমারো তো খিধে পেয়েছে! —ও-বেলা রাগ করে ভাত ফেলে উঠে গেলে—"

এবার সুলতা গর্জ্জে ওঠেন, "আমি তো রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে কেবল রাগই দেখাচ্ছি!"

"আঃ! তাই বলছি নাকি?—তোমার যত কথা!" ভোলানাথ মিষ্টি করেই একগাল হেসে ফেললেন, "এবার ওঠো তো লক্ষ্মীটি! তোমার খিধে না পাক্, আমার তো পেয়েছে।"

এই একটি অমোঘ অস্ত্র ভোলানাথের ভালোই জানা আছে। কথার ফাঁকে সময় বুঝে খাপ মতো 'ভীষণ ক্ষুধার' বার্ত্তাটা জানিয়ে দিয়ে

স্বরী কত দিনের কত বড় জেদের পাহাড় জল হয়ে গেছে—আজো গেল।
এতক্ষণে সুলতা উঠে দাঁড়ান।
চাকর লালুকে ভাত বেড়ে দিয়ে সুলতা পাখা হাতে স্বামীর খাবারের সামনে এসে বসেন চিরদিনের অভ্যাসবশে।
ভোলানাথ খেতে খেতে এক সময় জিজ্ঞাসা করেন, "অজিত আজকাল আর আসে না। তুমি বুঝি তাকে—"
"হ্যাঁ, এখানে আসতে আমি বারণ করে দিয়েছি।"
"কেন ?"
"কেন ! আমায় নিয়ে গাঁয়ে কী-যে সব রটনা হচ্ছে তা বুঝি তোমার কাণে ঢোকে না ?"
"লোকের কথায় আমাদের কী এসে যায় সুলু", সহজকণ্ঠেই ভোলানাথ বলেন, "তুমি আমি আর অজিত এই তিনজন তো বেশ জানি, এ-সব কত বড় মিথ্যে কথা।"
"মিথ্যে হলেও আমি যে মেয়েমানুষ !" দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে উত্তর করেন সুলতা।
"মেয়েমানুষ বলে তুমি বুঝি আর মানুষ নও !"
"থামো ! শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না !—মেয়ে আবার মানুষ কি-না !" এবার ঠিক রেগে নয়, একটু রহস্যের মেশাল দিয়ে সুলতা দেবী বলে গেলেন, "এই দ্যাখো না কেন, এ ক'মাস বাতাসীর অসুখে তুমি দিনেরাতে কোন্ আর বার পঞ্চাশেক ওদের বাড়ী যাতায়াত করো নি, বলো ? বাতাসী সেরে ওঠার পরেও ত অমন কতবার তুমি—। কৈ, তোমার চরিত্তির নিয়ে তো কেউ কিছু বলছে না ! আর, অজিত ঠাকুরপো মাঝে মাঝে এখানে আসে, তাই নিয়ে তোমাদের গাঁয়ে কী সব কাণ্ডই না হচ্ছে।"

"লোকের কথায় কাণ দিলে বুঝি চলে—"

"তোমার মনেই বা সন্দেহ দেখা দিতে কতক্ষণ—" কথাটা বললেন সুলতা গম্ভীরভাবে। পরক্ষণেই স্বামীর ব্যথিত মুখখানির দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হেসে উঠলেন, "শত হোক, তুমি তো স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী—তুমি পুরুষ, আমি মেয়েমানুষ। তুমি কিন্তু অজিত ঠাকুরপোকে আর আসতে বলো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

ভোলানাথ নিঃশব্দে আহার সারতে থাকেন।

খেয়ে-দেয়ে শোবার ঘরে এসেই সুলতার অমন আপোস-মানা মেজাজ আবার বিগড়ে যায়। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, "বিছানায় না বসে খানিকক্ষণ ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বসলে কি গতর ক্ষয়ে যাবে?—বিছানা করব না?"

ভোলানাথ নিঃশব্দে চেয়ারটায় গিয়ে বসে পড়লেন—ভয়ে-ভয়েই যেন, অপরাধীর মতো।

বিয়ের যৌতুক বড় খাটখানার উপর পুরু বিছানা। পাশাপাশি দু'জোড়া মাথার বালিশ। দু'দিকে দুটো পাশবালিশ। দুজনের এই যথোচিত ব্যবস্থা সুলতা দেবী ভেঙ্গে দু' ভাগ করে নেন। ঘরের আর এক কোণে মেঝের উপর দেখতে দেখতে মাদুর বিছিয়ে আর একটা বিছানা করে ফেললেন। পাতলা তোষকখানি পেড়ে নিজের মাথার বালিশ দুটো আনতে আবার যান খাটের কাছে।

দূর থেকে বাধা দেন ভোলানাথ, "রোজ রোজ বলি, তবু তুমি কথা শুনবে না। যদ্দিন তোমার শরীরটা না সারছে, আমিই বরং নিচে শুই। কথা শোনো। তুমি আজ থেকে খাটের উপর শোও, লক্ষ্মী!"

ভোলানাথের সস্নেহ কণ্ঠস্বর আরও কোমল হয়ে আসে।

"আমার শত্তুরের অসুখ হোক", সুলতা ফোঁস করে ওঠেন, "ফিটের

ব্যামো নাকি আবার একটা ব্যামো!" ব'লেই পাতা বিছানাটা অকারণেই ঝাড়তে থাকেন। ভোলানাথ নির্ব্বাক।

পাশ বালিশটা নিয়ে যেতে যেতে সহসা পিছন ফিরে সুলতা তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "আমার অসুখ যদি না সারে, তুমি চিরকাল মাটিতে শোবে?"

তাঁর কথা বলার ভঙ্গী দেখে ভোলানাথ বহু আগেই চুপ করে শুধু চেয়ে আছেন।

"আমার জন্যে রোজ রোজ মেঝেতে শুয়ে তুমি কেন শরীর খারাপ করতে যাবে? কোন্ দুখ্খে শুনি?—তুমি না পুরুষমানুষ!"

ভোলানাথ তেমনি নীরব।

"বৌ-এর উপর অত দরদ ভালো নয় গো। ছ্যা! লোকে নিন্দে করবে যে!"

বিদ্রূপটা এবার ভোলানাথ আর গায় না মেখে পারলেন না। বললেন, "তোমার ভালোমন্দের জন্যে আমি লোকের কথা শুনে চলব না কি?"

"না চলতে মাথার দিব্যি দিচ্ছে কে?"

"বাঁকা কথা ছেড়ে সোজা কথায় বলো।"

"আবার সহজ করে বলব কী?—আমার জন্যে দশের কথা তুমি অগ্রাহ্যি করে উড়িয়ে দেবে, একেমন ধারা পত্নীপ্রেম গো।" বলেই সুলতা অদ্ভুত হাসি হাসেন।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেন ভোলানাথ, "সুলতা, একটু মন চেয়ে কথা কয়ো। অধর্মের কাজ করো না। গাঁয়ের লোকের কথায় আমি যদি কাণ দিতাম, তা হলে এদ্দিনে—"

"তা হলে এদ্দিনে কী করতে, শুনি একবার?" সুলতা খিলখিল করে হেসে ওঠেন।

"লোকের কথায় আমি বিশ্বাস করি না একথা তোমায় আমি কতবার করে বলব?" অভিমানে ভোলানাথের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।
"বিশ্বাস করো না? মাইরি! সত্যি বল্‌ছো?"—বিদ্রূপের শেষ হাসিটুকু চেপে এবার সুলতা দেবী মুহূর্ত্তে গম্ভীর হয়ে ওঠেন, "অজিত ঠাকুরপো আমাদের বাড়ীতে এলেই অমন মুখ ভার করে থাক কেন, শুনি? তারপরেও বলতে চাও, তুমি স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ কর না?"
"রাতদুপুরে একটা ঝগড়া বাধাবার মতলবে আছো, না?"
"সত্যি কথা বললেই বাবুর গায় ফোস্কা পড়ে!" সুলতা ছ্যাঁক করে ওঠেন।
ভোলানাথ আর ঘাঁটাতে সাহস পান না। এবার একেবারেই ভোলানাথ বনে গেলেন। লোকটা যে কোনোদিন কারু কথার পিঠে একটা কথাও বলতে পারে এমন কথা তাঁর মুখ দেখে এখন বোঝবার উপায় নেই।
"চুপ করে রইলে যে বড়?" খুঁচিয়ে তোলেন সুলতা।
কিন্তু স্বামী তাঁর নির্ব্বিকার।
"তুমিও বলো না কেন, গাঁয়ের পাঁচজনের মতো তুমিও কথাটা ছড়াতে থাকো—স্ত্রী আমার অসতী—"
তবু স্বামী মুখ খোলেন না।
"আমি খারাপ, আমি নষ্ট—হায় ভগবান! তুমিই জানো", শূন্যে চোখ তুলে ধর্ম্ম সাক্ষী করে সুলতা রাগে দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন এবার' "অজিত ঠাকুরপো আমার নিজের ছোট ভাই-এর মতো—আমার পেটের শত্তুর বেঁচে থাকলে আজ তারও বিয়ের বয়স হত গো, আর সারা জীবন কাটিয়ে এসে শেষ কালে ঘরের লোকেও কিনা—" সুলতা ফুঁপিয়ে কাঁদতে বসলেন।

ভোলানাথের এবার ধ্যান ভঙ্গ হয়। আজ আবার একটা কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হবে এই রাতদুপুরে। বিশ্বাস কি, আর খানিক বাদেই স্ত্রী হয়তো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সুরু করবে, সর্ব্বাঙ্গ তাঁর কাঁপতে থাকবে মাথার চুল ছিঁড়বে, হাত-পা ছুঁড়বে—এক বিত্রস্ত বিপর্য্যস্ত অবস্থায় আবার সেই মূর্চ্ছা! স্ত্রীর এই মূর্চ্ছাটাকেই ভোলানাথ ভয় করেন সব চেয়ে বেশী। সংজ্ঞাহারা আলুথালু সুলতার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর সর্ব্ব শরীর যেন পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসে—লজ্জায়, দুঃখে, আতঙ্কে!

"তুমি পাগল, না খ্যাপা!" স্ত্রীর কাছে গিয়ে অপরাধীর মতো অনুচ্চ কণ্ঠে স্বামী বলতে থাকেন, "আমায় তুমি আগাগোড়া ভুল বুঝে এসেছ সুলু! আমার মনের কথা ভগবানই জানেন। এই তোমায় ছুঁয়ে শপথ করছি—বিশ্বাস করো, আমি লোকের কথায় কান দেই না। গাঁয়ের এই শেয়াল-কুকুরগুলোর চিৎকার শুনে—"

সুলতা তেমনি চোখের জল ফেলতে থাকেন। মুখের দাপট বন্ধ হয়েছে যা হক। ভোলানাথ অনেকখানি নিশ্চিত হন। আর উচ্চবাচ্য করতে ভরসা পান না। কি বলতে কি হয় কে জানে। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে গেলেন নিজের বিছানায়।

সুলতাও শুয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে টুংটাং শব্দ করে চুঁড়ি ক'গাছা। খানিক বাদে চাপা গলায় স্বামীকে ডাকেন, "ঘুমুলে না কি গো?"

"হুঁ"

"হুঁ কি গো! এই যে কথা বলছ।" অন্ধকারে এক ঝলক মিষ্টি হাসি হাসেন সুলতা—স্বচ্ছন্দে, সশব্দে।

আশ্চর্য্য! খানিক আগেই যে এই ব্যক্তিটি রাগে ফেটে পড়েছিল কে তা বিশ্বাস করবে!

ক্ষণে ক্ষণে কতই রূপ!

"বাতাসী আজকাল কেমন আছে ?"

ভোলানাথ এ-কথার কোন জবাব দেন না। ইদানীং সময় নেই অসময় নেই বাতাসীদের কথা তুলে সুলতা অকারণেই স্বামীর সঙ্গে যত সব ইতর রসিকতা সুরু করেন। অথচ সুলতা বেশ জানে, অমন সন্দেহ তার মনের ত্রিসীমানায়ও নেই। তার স্বামীর সঙ্গে বাতাসীর একটা··· সূর্য্য পশ্চিমে ওঠার মতোই অসম্ভব। তবু কেন যেন স্বামীকে কৌতুকের অন্তরালে খোঁচাতে বড় ভালো লাগে তাঁর। লোকটা রাগে না কিছুতেই—এই যা আপশোস! ভোলানাথই বটে।

"বাতাসীর ছেলেটার নাকি বড় অসুখ ?"

"দ্যাখো, তোমায় কদ্দিন বলেছি বাতাসীকে নিয়ে আমার সঙ্গে অমন বিশ্রী ঠাট্টা তুমি করো না আর", অন্ধকারে ভোলানাথের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে, "তুমি আমায় সন্দেহ করে"—

"না গো না", সুলতা খিল খিল করে হেসে ওঠেন", তুমি যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছ। ঠাট্টা-মস্করাও বোঝ না। সারা গাঁয়ের লোক তোমার বৌ-এর পেছনে লেগেছে, আমি না হয় একটু মিছিমিছি তোমার পিছু লেগে দেখলাম বাপু! তাতে তো তুমি আর সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেলে না। ঘুমোও দিকিনি এবার।" এই গদ্গদ কণ্ঠস্বরের জবাবে ঐ বিছানা থেকে আগ্রহের এতটুকু উত্তাপও মেলে না কিন্তু।

খানিক বাদে আবার প্রশ্ন, "শুনছ ?···ঘুমিয়ে পড়লে এরি মধ্যে ?"

ভোলানাথ মড়ার মতো পড়ে থাকেন—নিশ্চুপ, নিশ্চল।

মিনিটের পর মিনিট যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কত রাত কে জানে। কিন্তু অন্ধকারের দু'টি প্রাণীই একটি কথা ঠিক জানে: অপর পক্ষও ঘুমোয় নি এখনো। সময়ের পায়ে যেন গোদ। রাতের পথ ফুরায় না!

পরদিন সকাল বেলা।

জানালা দিয়ে অজস্র কাঁচা রোদ এসে পড়েছে সেই খাটখানার উপর। কাল রাত্রের হু' হু'টি আলাদা বিছানা আজ ভোর থেকে যেন মন্ত্রবলেই এক হয়ে গেছে। গদী আর হু'খানা তোষকের উপর আরামের পুরো বিছানা। ধবধবে ফরসা চাদর। পাশ বালিশ হু'দিকে হু'টো। হু'জোড়া নরম তুলতুলে মাথার বালিশ। স্বামীর পায়ের কাছে যথাস্থানে সেই ছোট্ট তাকিয়াটা। দিনমানের অভিন্ন বিছানাখানি!

ভোলানাথ ডাক্তার। ঘরে বসে নিজে নিজেই গোটা হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রটা নাকি তিনি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ফেলেছেন। গাঁয়ে অসুখ-বিসুখ দেখা দিলে আগে পড়ে তাঁর ডাক। ভিজিট দিতে হয় না। ওষুধের দামও বাকী রাখা যায়। কোনো ক্ষেত্রে না-দিলেও চলে। ভোলানাথের পয়সা আছে, আর আছে সখ। ওষুধ আনেন বিস্তর, আর পরোপকার করে পুণ্য অর্জ্জন করেন যথেষ্ট।

আজকাল ভোলানাথ বড় একটা বাড়ীর বার হন না। স্ত্রীকে বলেন, রোগীপত্তর নেই আর।

আজ সকালেও হোমিওপ্যাথি বই সামনে নিয়ে বসে জানালার বাইরে চেয়ে আছেন ভাবিতলোচনে।

সুলতা ঘরে ঢুকে আড়চোখে স্বামীকে একবার দেখে নিলেন। এখনো রোদ চড়ে নি, কিন্তু মেজাজ চড়তে সুরু করে দিয়েছে। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি, তাঁর কি দোষ!

সুলতা পাতা বিছানাটা আর একবার ঝেড়ে নিয়ে ফের পাততে পাততে বললেন, "বাড়ির বাইরে যাও না গো। পুরুষমানুষ রাতদিন ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকতে হাঁফ ধরে না তোমার ?"

"কোথায় যাব, বলো ?"

"বাতাসীদের বাড়ী যাও না। লোকে যে আমার নিন্দে করে। বলে আমি ভাতারকে গুণ করেছি। —আর আমিই জানি, তুমি ঘর ছেড়ে নড়তে চাওনা কিসের জন্যে।"

"কী জানো তুমি?"

"কিচ্ছু না", সুলতা হেসে ফেললেন, "আমার শরীর খারাপ—কখন কী হয়, তাই তো তুমি বাইরে বেরোও না। লোকে তা বুঝবে কেন, বলো। পুরুষকে পুরুষের মতোই হতে হয়, বুঝলে?" চাপা হাসির অন্তরালে আসল কথার আভাষ কিন্তু চাপা থাকে না। "তুমি না ব্যাটাছেলে গো!"

"কোথায় যাব?"

"বাতাসীর ওখানে যাও না একবার।"

"ওর অসুখ তো সেরে গেছে।"

"গেলই বা। তাই বলে খোঁজটা-আশটা নিতে নেই বুঝি! বাতাসীর কোলের মেয়েটাকে এঁড়েয় ধরেছে—তোমার ওষুধে ধরে কিনা দেখো না একবার চেষ্টা করে"—বলতে বলতে এতক্ষণের নরম কণ্ঠস্বর একটু গরম হয়ে ওঠে, "যা হক্ একটা কিছু করো বাপু! ঘরে বসে বৌ-এর আঁচলের নিধি হয়ে বসে থেকো না। লোকের কথা আমি সইতে পারি না।"

ভোলানাথ ছাতা হাতে এক-পা দু-পা করে ঘরের বাইরে আসেন।

"চলে গেলে না কি?"—সুলতা দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে পিছু ডাকেন।

নির্ব্বাক ভোলানাথ ফিরে তাকান।

"কিছু খেয়ে বেরুলে হত না!—আসবে তো সেই কোন্ দুপুরে।"

"না।"

'না' মানে কি: কিছু খাবেন না, কিম্বা ফিরতে দেরী করবেন না: ভোলানাথের সংক্ষিপ্ত জবাবে তা বোঝা যায় না।

"রাগ করলে না কি!" সুলতা সহাস্যে সমস্ত ব্যাপারটা হালকা করে দিতে চাইলেন, "তুমি যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছ! হেসে কথা কইতে যেন কত কষ্ট হয় তোমার। আমি মরলে তুমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচো।"

ভোলানাথ এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হয়ে যান।

দুয়ারের কাছে বসে বেশ খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সুলতা ঘরের মধ্যে এসে মাটিতেই বসে পড়লেন। আধ ঘণ্টাটাক ঠায় বসে বসে কাটিয়ে দিলেন। ভাবতে থাকেন, কত কী আকাশপাতাল! এরি মধ্যে অমন বার পাঁচেক বালিশগুলো সরিয়ে বিছানাটা অকারণেই ঝেড়ে রাখেন, চাদর তুলে আবার পাড়েন, মশারিটা পেড়েই আবার গুটিয়ে রাখেন। ইদানীং সুলতার এ একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাতিক ছাড়া আর কী বলা যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাতা বিছানা আবার পাড়েন। বিছানা করা যেন তার কিছুতেই মনঃপুত হয় না। স্বামী কিছু বললেই ঝেঁজে ওঠেন, "নোংরামি আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। ভালো না লাগে বাতাসীদের বিছানায় গিয়ে বসে থেকো—জন্মে যারা বিছানার চাদর ধোপায় দেয় না।"

মজা এই, সারা দিনে তাঁর এই পাতা বিছানায় কাউকে বসতে দেন না। নিজেও বসবেন না, স্বামীকেও একটু গড়াগড়ি দিতে দেবেন না। পাড়ার লোকে অবশ্য বলে বেড়ায়, ঐ বিছানায়ই বসে অজিত ছোঁড়াটা কী হাসাহাসিটাই না করে!

ঘণ্টাখানেক বাদে বাইরে কে ডাকে, "বৌমা-দিদি, কোথায় গো?"

"কে কালুর-মা! আমি এ-ঘরে, এসো এখানে" স্নলতা দোরের কাছে এগিয়ে এলেন।

"দাদাঠাকুর বাড়ী নেই ?"

"না।"

"আমার নাতনীর ওষুধ নিতে এসেছি। কখন ফেরবেন উনি ?"

"কি জানি।"

"কোথায় গেছেন ?"

"কে জানে কোথায়।" নির্লিপ্তের মতন উত্তর দেন স্নলতা। সহসা কি একটা কথা মনে পড়তেই বলে ওঠেন, "আচ্ছা কালুর-মা, তুমি যে সেদিন বল্‌ছিলে—"

"কী কথা, বৌমা-দিদি ?"

"বলছিলে না, তোমার দাদাঠাকুর যে ঘন ঘন বাতাসীদের ওখানে যায় সেটা ভালো নয়। বলো নি ?"

"বলেছি না কি ?" কালুর মা হেসে ফেললেন, "তা ভালোমন্দের ভয়ডর তো আছে, দিদিমণি। বাতাসীর বয়েসটাই বা কী!—ওর মাকে আমি হতে দেখেছি গো। তা, দাদাঠাকুরের বয়েসও তো—"

তোমার দাদাঠাকুরকে বুঝি সে-রকম লোক ভেবেছ কালুর মা ?" সহাস্যে প্রতিবাদ জানান স্নলতা। হাসি ছাড়া আর কি!

ব্যাপারটা একেবারে ভিত্তিহীন বলেই না স্নলতা অমন সহজ মনে কালুর মার সঙ্গে রহস্য করছেন!

"অত নিশ্চিন্তে থেকো না বৌ, পুরুষের মন—বলা যায় না। তায় তোমার যে অসুখ—"

"আমার আবার অসুখটা কোথায়, কালুর মা ?— দেখছ না, দিনের পর দিন আরো ফুলে উঠ্‌ছি" বলেই হি-হি করে হেসে ওঠেন।

"অসুখ নয় ?—ভারী অসুখ তোমার। মাঝে মাঝে ঐ যে মূর্চ্ছা যাও সে ব্যায়রামটা বুঝি কম!"

"তার জন্যে ঘরের লোক পর হয়ে যায় না কি ?"

"না-না, তা বলছি নে বৌমাদিদি! তবে মেয়ে মানুষের বরাত—বালুর বাঁধ। সাবধান হতে হয় বৈকি।"

"বাতাসীর সঙ্গে ওঁকে তুমি—আচ্ছা কালুর মা", গাম্ভীর্য্যের ভান করে অনুচ্চস্বরে প্রশ্ন করেন সুলতা, "ভয় নেই। আমায় তুমি বিশ্বাস করো। কাউকে বলবো না তোমার কথা। বাতাসী বুঝি খুব—"

"না-না দিদিমণি, সে-সব কিছু নয়। তবে কি জানো", কালুর মা গলাটা খাটো করে আনেন, "বাতাসীর সঙ্গে অত হাসাহাসি করাটা কি ভালো, বলো ?"

"তুমি দেখেছ ?—নিজের চোখে ?"

"না বৌমা! লোকে বলাবলি করে কি না।"

"কী বলে লোকে ?"

"বলে তেনার কী দোষ! পুরুষ মানুষ ঘরে ঠাঁই না পেলে—" বলেই কালুর মা থম্‌কে থামেন। যে-কথাটা এখানে বলা যায় না তা-ই হঠাৎ মুখ ফসকে বার হয়ে যাচ্ছিল আর কি!

মুহূর্ত্ত মধ্যে সুলতার মুখখানি ছাই-এর মতো সাদা হয়ে যায়। পরক্ষণেই ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ধরা গলায় বললেন, "এবার যাও কালুর মা। ও-বেলা এসে ওষুধ নিয়ো।" বলেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

কালুর মা বিপদেই পড়ে। ভেবেছিল, এ-কথায় সে-কথায় মন ভিজিয়ে সুলতার কাছ থেকে আজ এক ফালি কুমড়ো আর গোটা কয়েক লঙ্কা চেয়ে নেবে। সে গুড়ে যে বালি! বৌমাদিদি তার পেটের কথা টের

পেয়েছেন এ বুঝতে তার দেরী হয় না। তবু সে হাল ছাড়ে না। আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসে।

রান্নাঘরে সুলতার মনে তখন প্রবল ঝড়।······কি করেছে সে? গ্রামের লোক রাতদিন মিথ্যা অপযশ গাইবে কেন? কিসের জন্য? স্বামীর অনুরোধে অজিত মাষ্টার সেবার তার অসুখের সময় শুশ্রূষা করেছিল, সে অপরাধও কি সুলতার? সে তো জানে—আর জানেন ভগবান—মনে মনে আজো সে খাঁটিই আছে। তবে?······

হ্যাঁ, অজিত এ-বাড়ীতে ঘন ঘন আসে। ঘরে কোনো নূতন জিনিষ এলে, ভালোমন্দ কিছু রান্না হলে,—সত্য বটে—সুলতা তাকে খবর দেন। স্বামী কিছু মনে করেন না—বরং প্রথম প্রথম তাঁর অনুরোধেই তো অজিতকে তিনি কত দিন ডেকে এনে খাইয়েছেন। তাতে এমন কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়? অজিতের বয়েসটা না হয় তার সমানই হল—না হয় দু' এক বছরের বড়ই হল সে। তাতে কি? ভাইএর মতো ভেবে কি তাকে ভালবাসতে পারেন না সুলতা? অনাত্মীয় বলে কি তার সঙ্গে দুটো কথা বললেও ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যায়?······

সুলতা ভিতরে ভিতরে ফুলে ফেঁপে ওঠেন দারুণ আক্রোশে। কিন্তু এই ক্রোধের সমান্তরাল হয়েই মনের আর এক কোণে বড় আশার ক্ষীণ রেখার ধারা বয়ে চলেছে কালুর মার কথাগুলো!······বাতাসী! সত্যই তো। বাতাসীর এমন কি-ই বা বয়েস! হলই বা সে তিন সন্তানের মা। বলা তো যায় না। অবশ্য সুলতা এমন অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না কিছুতেই, কোনো প্রমাণেই। তবু······! হক না এই অসম্ভবও সম্ভব। কি এমন আসে যায় তাতে। স্বামী তো তাঁর পুরুষ-মানুষ! জাত গেলেও ভাতে মারবে না কেউ। সুলতা না হয় কাঁদবেন, কোঁদল করবেন, কেলেঙ্কারির সৃষ্টি করবেন।

তবু, কালুর মার মিথ্যা কথাই সত্য হক্। তার মুখে ফুল-চন্দ ন পড়ুক।
কালুর মা ডাকে, "বৌমাদিদি? কী রাঁধছো আজ?"
সুলতা বাইরে এসে বসেন।
"বৌমণির আজ শরীর খারাপ না কি?"
"না গো না। তোমরা সবাই মিলে কেবল আমার শরীর খারাপই ছাখো। আমার আবার অসুখটা কোনখানে?" বলেই সুলতা কাষ্ঠ হাসি হাসেন, "আচ্ছা, কালুর মা! বাতাসীদের ওখানে কত্তাবাবু বুঝি প্রায়ই যায়?"
কালুর মা দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। আজ তাদের বাজার হয় নি। এক ফালি পাকা কুমড়ো আর গোটা আষ্টেক লঙ্কা আজ চাই-ই চাই। জবাব দিল, "হ্যাঁ গো বৌমাদিদি!"
"তুমি কী করে এত সব কথা জানো বলো তো?"
"আমি যে ও-বাড়ী ধান ভানতে যাই গো।" সুলতার জিজ্ঞাসু মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে কালুর মা ভরসা পায় চতুর্গুণ, "খালি ঘরে কত্তাবাবু বাতাসীর সঙ্গে এত কী ফিস্ ফিস্ করে, বলো তো?
"সত্যি কালুর মা?"—কালুর মার এই চূড়ান্ত মিথ্যা কথাটা বুঝে নিয়েও সুলতা বিপুল উৎসাহে কাণ খাড়া করে থাকে।
"সত্যি বলছি বৌদিদিমণি!—পরশু তো নিজের চোখেই দেখলাম! ওদের বড় চৌকির উপর কত্তাবাবু বসে আছেন—অভ্যখারে ছুঁড়িটা পাখা নিয়ে তেনারে বাতাস করছে না ছাই! বেহায়ার বেহদ্দ! কেবল হি-হি-হি আর হো-হো-হো! এ আবার কী হাসি গো।—এখন থেকে সাবধান হও বৌমাদিদি। অত রাশ আলগা করো না—শেষকালে কেঁদে মরবে।"

"ও তুমি নিজের চোখে ছাখো নি কিছু!" সুলতা আরো আগ্রহ দেখান।

"আর দেখব কী! তুমি একেবারে ন্যাকা বৌমাদিদি, কিচ্ছু বোঝো না যেন।"

সুলতা বুক-ভরা হাসি চেপে আবার রান্না ঘরে ফিরে যান। কুমড়া আর লঙ্কা নিয়ে কালুর মা খানিক পরেই বিদায় নেয়। সুলতাকে আরো একবার সাবধান করে দিতে ভোলে না।

ভাতের হাঁড়ির গলা অবধি জল চাপিয়ে দিয়ে সুলতা বড় ঘরে আসেন।

কি ভেবে আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। সামনের জানালাটা সটান খুলে দেন। সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে বার কয়েক ভালো করে দেখে নেন নিজেকে। একবার বাঁ দিকে মুখ ফেরান, আবার ডান দিকে। বড় আরশিখানির মধ্যে প্রতিফলিত হয় একজোড়া আয়ত চোখের চাপা হাসি।......হ্যাঁ, ভাঁটার ডাক আসতে এখনো বেশ কিছু দিন বাকী! সারা গ্রামে আজো সে সব চেয়ে সুন্দরী এ-কথা তার শত্তুরেরাও স্বীকার করবে। চোখ দুটি তেমনি খাসা। চুলের মাথায় মাথায় কিছু ক্ষয় হয়েছে, তবু এত লম্বা চুলের গোছা ক'টা মেয়ের? এমন গায়ের রঙ বাস্তাসীর? ফুঃ! গাল দুটিতে একটুখানি ভাঙন ধরেছে। তা হক্। তবু সে, নিঃসন্দেহে, যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে। বিবাহিত জীবনের এই সুদীর্ঘ তের বৎসর পরে আজো তাকে বুড়ী বলবে এমন কাণা আছে নাকি কেউ! পান খাওয়া লাল টুকটুকে ঠোঁটটি উল্টে আয়নার বুকে সুলতা আর একবার গর্ব্বের হাসি হেসে নেন।......

"লালু!"

বার দুই ডাকাডাকির পর ভৃত্য এসে কাছে দাঁড়ায়।

"কী মা ?"

"আজ বিকেলে যেন না বলে কোথাও বেরিয়ে যাস্‌নে—তোকে একবার বৈদ্যিপাড়া যেতে হবে।"

কোথায়, কোন্ বাড়ী, কার কাছে লালুকে সে-সব আর বলে দিতে হয় না। এ কয়দিন সে কেবল একটা কথাই বুঝে উঠ্‌তে পারে নি, মাষ্টারবাবু আজকাল আর আসেন না কেন এবং সেদিন যে অমন একটা ভুরিভোজন হল বাড়ীতে গিন্নীমা বৈদ্যিপাড়ায় চিঠি দিয়ে আসতেই বা তাকে পাঠালেন না কেন !......

—"আর গোয়াল-বাড়ী গিয়ে বলে আসবি, ও-বেলা সের তিনেক দুধ চাই—সন্ধ্যের আগেই যেন দিয়ে যায়। পায়েস হবে আজ !"

লালু আদেশ শিরোধার্য্য করে চলে যায়।

সুলতা ডাল নামিয়ে রেখে স্নান সেরে এসে চুল বাঁধতে বসেন। অনেক দিন পরে আজ ঘটা করেই খোঁপা বাঁধবেন। কি এমন বয়স হয়েছে তাঁর ? আজো তাঁকে নির্ব্বিবাদে কুড়ি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।......

বাতাসী ! কালুর মার কথা সত্যও তো হতে পারে। হতে পারে কি, নিশ্চয়ই সত্য !......হক্ না !......অজিত ঠাকুরপো আজ ও-বেলা এখানে খাবে। তার চিঠি পেয়ে নিশ্চয় আসবে সে। না এসেই পারে না। তাকে আসতেই হবে। এক মাথা ভেজা চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে সুলতা মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করে, আজ থেকে সারা গ্রামের বিরুদ্ধে একাই যুঝবেন তিনি। কোথা থেকে যেন অপরিমেয় শক্তি আজ লাভ করছেন।...খোঁপা তুলতে তুলতে হাসেন সুলতা।

ভোলানাথ ঘরে ঢোকেন। তাঁর বিস্মিত দৃষ্টির সঙ্গে আরশির উপর বিনিময় হয় সুলতার স্তিমিত দৃষ্টির।

· করে হেসে সুলতা সরে এসে বললেন, "এতক্ষণে বাড়ীর কথা মনে পড়ল ? ধন্যি বাবা !"

"এখনো তো এগারটা বাজে নি"—

সে-কথায় কর্ণপাত না করে সুলতা হেসে হেসে বলে যান, "তা, নাওয়া—খাওয়াটাও বাতাসীর ওখানে সারলেই পারতে।"

ভোলানাথ নিঃশব্দে গিয়ে বিছানার এক কোণে বসে পড়েন। এ-সব বিশ্রী রসিকতার উত্তর না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

"সরো একটু। বিছানা ঝেড়ে দিই, তার পরে বসে বাতাসীর কথা ভাবো।"

"ত্যাখো সুলু", ভোলানাথ উষ্ণ হয়ে উঠলেন, "বাড়াবাড়িরও একটা মাত্রা আছে জেনো।"

বিছানাটা অকারণেই আবার ঝাড়তে ঝাড়তে সুলতা জবাব দেন, "চটো কেন! কী এমন অপরাধের কাজ করেছ, এঁ্যা! পুরুষ তুমি! মাকড় মারলে ধোকড় হয়।—যাক্, বাতাসীর ভাগ্য ভালো।"

রাগে ভোলানাথের বাক্যস্ফূর্তি হয় না। ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে আর কাঁপে হাত দুটো।...ইতর!

স্বামীর মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন সুলতা। এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বুঝতে পারেন, স্বামীর বুকের মধ্যে একটা অক্ষম আক্রোশ মাথা খুঁড়ে মরছে এখন। দেখতে দেখতে তাঁর মনেও সুরু হয় অসহ্য তোলপাড়। স্বামীর একখানা হাত চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "তুমি পাষাণ! সত্যি যদি না-ও হয়, একবার মিথ্যে করেই না হয় বলো—বাতাসী তোমার"—

"কী সব বলছ তুমি?"—ধমকে ওঠেন ভোলানাথ।

"কী বলছি! হঁ্যা, তাই তো, কী যেন বলতে চাই", সুলতা স্বামীর হাতখানি ঝাপটা মেরে সরিয়ে দেন, "বলছিলাম, অত ভালোও ভালো নয়। তুমি পাষাণ!" রুদ্ধকণ্ঠে বলতে থাকেন সুলতা "বলো, তোমার

দুটি পায়ে পড়ি, আমার কাছে লুকিয়ো না—বলো, সত্যি না হলেও এ কবার না হয় মিথ্যে করেই বলো বাতাসীকে ভালবাসো তুমি, তার কাছেই মন তোমার পড়ে আছে। ওগো, আমি তাহ'লে রেহাই পাই, গাঁয়ের লোকের সব কুৎসা সব নিন্দা আমি সত্যি বলেই মেনে নেব—আমি যে তাহলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।" কাঁপতে কাঁপতে মুখের কথা বন্ধ হয়ে সংজ্ঞাহারা দেহটা সুলতার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ভোলানাথ অস্থির হয়ে ডাকাডাকি সুরু করেন—"মণির মা শীগগির এ-ঘরে এসো। ওরে লালু, বৈঠকখানার ঘর থেকে ব্লটিং পেপার নিয়ে আয় চট করে। পাখাখানা কোথায়?—পাখা?"

যযাতি

শনিবারের আপিস করিয়া রমানাথবাবু আজ বাসায় ফিরিতেছেন সকাল সকাল—বেলা তিনটায়। খুশমেজাজে সিঁড়ির পথে উঠিতে উঠিতে ভাবিতেছিলেন বোধহয় গৃহিণী সুরমারই মুখখানি।

কিন্তু শোবার ঘরের দোরগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই গৃহকর্ত্তার চক্ষু স্থির। এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম?—তাঁহার প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় যে জন সে কিনা তখন তাঁহারই বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া একদৃষ্টেচাহিয়া আছে সামনের বাসার ছাদে!

রমানাথবাবুর অমন সশব্দ আবির্ভাবেও কিনা ধ্যান ভঙ্গ হয় না! এতই তদ্‌গত ভাব! ও-বাসার প্রাণীটিই বরং দূর হইতে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া চোখের পলকে পিছন ফিরিয়া প্রস্থান করিল চিলে-কোঠায়।

এ কি অপ্রত্যাশিত অঘটন! সারা ঘরটি তথা গোটা পৃথিবীটাই যেন রমানাথবাবুর মগজের মধ্যে একবার ঘুরপাক খাইয়া লইল মুহূর্ত্ত মধ্যে।

হতভম্ব রমানাথ এক পা দু'পা করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলেন সটান রান্নাঘরে।

"শুনছ?"

"কী?"

"তোমার যদি কোন দিকে এতটুকু হুঁস থাকে!"

"কী হল আবার?"

"আঃ! আস্তে কথা বলো না।—শুনতে পাবে।"

"কে?"

"খোকা।" গলা খাটো করিয়াই কহিলেন রমানাথ।

"কী করলো খোকা?"

এই মাত্র স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিলেন সেই দৃশ্যটাই স্ত্রীর কাছে যথাযথ বিবৃত করিয়া রমানাথ মন্তব্য করিলেন, "তাই না প্রায়ই বাসায় ফিরে দেখি, খোকা আমাদের ঘরের বিছানায় জানালার কাছটায় শুয়ে বসে কাটায়। গতিক ভাল নয় গো। ছেলে তোমার আর ছোট্ট ছেলেটি নেই।"

"কী যে সব বলো", সুরমা তাহাদের একমাত্র সন্তানের সম্বন্ধে এই বিশ্রী শঙ্কাটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, "খোকা আমার সে রকম ছেলেই নয়।"

"তোমার ছেলে তোমার কাছে না হয় সে রকম কিছু নয়, কিন্তু ওদের মেয়েটি কোন্ রকম তা জানো? ছাতে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে—"

বাধা দিয়া সুরমা কহিলেন, "তোমার যত অনাচ্ছিষ্টি কথা! ওদের রেণুকার বয়েসটা কি শুনি? ঐটুকুন তো মেয়ে—"

—"একেবারে কচি খুকীটি! কত বয়েস?"

"কত আর হবে ?—পনের কি ষোল।"

রমানাথ মুচকি হাসিয়া কহিলেন, 'তা ষোল বছরের খুকীই বটে!—এ বয়সে খোকা তোমার পেটে এসেছিল, মনে আছে ?"

মনে না থাকিবার কথা নয়। সুরমা তাই মৃদু হাসিয়া মাথা নোয়ায়।

"এখন থেকে সাবধান হও। দিনকাল ভাল নয়, দেখছো তো! সকালবেলা খবরের কাগজ খুললেই হয় লেকের জলে আত্মহত্যা, নয় তো পটাসিয়াম সায়নাইডে সুইসাইড—না হয় পাঁচতলার ছাত থেকে ড্রাম করে ফুটপাতে লাফিয়ে পড়ার বাহাদুরি!"

"তা, কী করতে হবে বলো।"

"পরদা খাটাও—দু'ঘরের দক্ষিণের জানালায় পরদা টাঙাও।"

"বেশ তো। আমি এখনি খোকাকে পরদা কিনে আনতে পাঠাচ্ছি।"

"সর্ব্বনাশ!" রমানাথ গমনোদ্যত পত্নীকে বাধা দিয়া কহিলেন, "আমি নিয়ে আসব। ওকে এখন বলতে যেয়ো না। আমরা যে কিছু জানতে পেরেছি তা যেন ও টের পায় না কখ্খনো। একবার জানাজানি হয়ে গেলে লজ্জা ভয় সব গ্রাহ্যিই করবে না আর।"

সুরমা গরম তেলে একসঙ্গে গোটা তিনেক বেগুন ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "শাসন করতেও তোমার আপত্তি, আবার তিলকে তাল করে আঁতকেও উঠবে।"

"ও সব তুমি বুঝবে না—সাইকোলজির কথা কিনা!"

"আমরা মুখ্খু-সুখ্খু, তোমাদের অত সব তত্ত্ব-কথের ধার ধারি নে। সোজা বলে দেবো, খোকা ওদের রেণু ছাদে এলে আর যেন তাকাস্ নে তার দিকে।"

"তা হলেই অকালে ছেলেটার তুমি মাথা চিবিয়ে খাবে।—তোমায় কিছু

করতে হবে না। যা করবার আমিই করব। আজই সন্ধ্যের পর পরদার কাপড় কিনে নিয়ে আসব'খন।"

মিনিট কয়েক বিস্তর বিচার-বিতর্কের পর রমানাথ এতক্ষণে আপিসের জামা-কাপড় ছাড়িতে ঘরে ফিরিলেন।

পুত্র সুবিমল গভীর অভিনিবেশ সহকারে বাবার বালিশে মাথা রাখিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়িতেছে।

খানিকবাদে দু'খানি প্লেটে লুচি আর বেগুন ভাজা লইয়া মা ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন,

"খোকা, ওঠ্"

উনিশ বছরের খোকা উঠিয়া বসিল। পিতাও প্লেট কাছে টানিয়া নেন। মা জলের গ্লাস আনিয়া সামনে রাখিলেন।

সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড যায়। তবু কাহারো মুখে কথা নাই। নির্ব্বাক ঘরখানি বড় বিশ্রী ঠেকে। নিতান্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

রমানাথ শঙ্কিত হন। খোকা কিছু টের পায় নি তো? অত গম্ভীর কেন আজ?

"খোকা!"

সুবিমল মুখ তুলিয়া বাবার দিকে তাকায়।

"পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?"

"তা—এই হচ্ছে কোন রকম।"

"তোদের ড্রামা কি-কি?"

"পাসে রয়েছে 'হ্যামলেট' আর 'টেম্পেষ্ট', অনার্সে 'রোমিও জুলিয়েট' আর 'কোরিওলিনাস!"

রমানাথ খানিক চুপ করিয়া থাকেন স্তব্ধের মত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালের কাণ্ডজ্ঞান দেখিয়া সত্যই রাগিয়া যান। এ না হইলে পরাধীন

দেশ বলিবে কেন ! আঠার-উনিশ বছরের ছেলেদের জন্য পাঠ্য কিনা 'রোমিও জুলিয়েট' ! যত সব—

"তোদের অনার্স ক্লাসে ক'টি ছাত্র ?"

"পঁয়ত্রিশ জন !"

অকারণেই একটু কাশিয়া লইয়া রমানাথ এবার প্রশ্ন করেন, "সবই বুঝি ছেলে ?"

"না, পাঁচটি মেয়েও এবার অনার্স নিয়েছে।"

"তা বেশ ! কো-এডুকেশনটা ভাল জিনিষ। একটা হেল্‌থি কমপিটিশন থাকে পড়াশুনায়।" পুত্র নির্ব্বাক।

"কো-এডুকেশনে অনর্থের সম্ভাবনাও রয়েছে, কী বলিস—এ্যাঁ ? যে সব ছেলেমেয়ের হেল্‌থি মাইণ্ড তাদের কথা অবশ্য আলাদা। তারা ওর ভালর দিকটাই গ্রহণ করে। কী বলিস ?"

পুত্র কিছুই বলে না। উৎসাহ পাইয়া পিতা আবার বলিয়া চলিলেন, "মনটাকে খুব উঁচু রাখবি—সব সময়। তোদের এখন ইম্‌প্রেসনবল্ এজ্ কিনা ! যা কিছু এখন ভালো বলে মনে হবে তার সবটাই আর ভাল নয় তাই বলে। রয়ে সয়ে বুঝে নিতে হয় সব কিছুই। তারই নাম না: জ্ঞানার্জন !"

সুবিমল মনে মনে হাসে। পিতার এই অযাচিত উপদেশ বর্ষণের আসল কারণটা আন্দাজ করিয়া লয়। ও-বাসার রেণুকার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার ব্যাপারটা আজ নিতান্ত এ্যাকসিডেণ্ট ! সহপাঠিনী বীণা মুন্সী, কেতকী সেন—এমন কি প্রীতি বোসের কাছেও নাকি রেণুকা ! ফুঃ !

চা লইয়া ঘরে ঢুকিয়াই সুরমা জিজ্ঞাসা করেন, "খোকা ! আমাদের জানালাগুলোয় পরদা টাঙালে কেমন হয় রে ? তোর মণিমাসীর শোবার ঘরের জানালায় যে রকম রঙীন কাপড় ঠিক তেমনি।"

রমানাথ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার সকল প্ল্যান মাঠে মারা যায় আর কি! তাড়াতাড়ি স্ত্রীর উৎসাহে বাধা দিয়া কহিলেন, "না না, জনালায় পরদা দিয়ে বাতাস বন্ধ করো না। আলো বাতাসের জন্যেই না কলকাতা ছেড়ে এসেছি এই বালীগঞ্জে।"

"বালীগঞ্জের লোকে যেন আর পরদা খাটায় না। এ-পাড়ায় কোন্ বাড়ীতে পরদা নেই একবার ঘুরে দেখে এসো দিকিনি!"

"লোকে যা করবে তাই বুঝি করতে হবে! যত সব ইয়ে—"

এবার সুবিমল মুখ খুলিল জননীর পক্ষে, "পরদায় এত আপত্তি জানাচ্ছ কেন বাবা? জানালার সবটা জুড়ে না টাঙালেই হল। উপরের আদ্দেক খোলা থাকলেই ঘরে ঢের আলো-বাতাস ঢুকবে।"

রমানাথ উল্লসিত হইয়া ওঠেন, "তা—তোর যখন ইচ্ছে, কালই কাপড় কিনে আনব'খন। কী রঙের কাপড় আনব খোকা?"

সুবিমল কোন জবাব না দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

"বেড়াতে বেরুচ্ছিস?"

"হুঁ"

"সকাল করে ফিরিস্।"

সুবিমল নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া যায়।

খালি ঘর পাইয়া এবার রমানাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

"তুমি সব পণ্ড করতে বসেছিলে আর কি!"

"হুঁ, ছেলে তোমার কচি খোকা! কিচ্ছু টের পায়নি! ও সব বুঝে নিয়েছে। বাপের তো ছেলে!"

রমানাথ স্ত্রীর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া লন। বছর কুড়ি আগের ছোট ইতিহাসটা আজ মনে হয় শুধু ছায়া ছায়া ভাসা ভাসা—সময়-সাগরের বুকে একটা বহুদূরবর্ত্তী দ্বীপখণ্ড।

বহুদিন পরে আজ রমানাথ পূব দিকের দেয়ালে তাকাইয়া দেখিলেন, খোকা হওয়ার বছরখানিক আগে তোলা নবদম্পতির সেই ফটোখানি যথাস্থানে নাই !

"এ দেয়ালের ফটোটা কোথায় গো ?"

"খোকার ঘরে ।"

খানিক চুপ থাকিয়া কহিলেন রমানাথ, "ওটা এ-ঘরে এনে রেখো। তোমার এতটুকু হুঁস নেই কোন কিছুতেই ।"

দোরের কাছ দিয়া শ্রীমান সুবিমল সশব্দে চলিয়া যায়। দুড়-দাড় করিয়া নামিয়া গেল সিঁড়ির পথে।

সুরমাও উঠিয়া পড়েন গৃহ কাজে।

রমানাথ কিন্তু চুপচাপ বসিয়া রহিল বহুক্ষণ। আজ আর বাহির হইবার ইচ্ছা নাই আদৌ।

সন্ধ্যার আর বেশী বাকী নাই। বেলা শেষের আলোটুকু আজ বড় বেসুর মনে হয় রমানাথের—কি জানি কেন। খানিক বসিয়া থাকিয়া এক সময় উঠিয়া দাঁড়ায়। ইজি-চেয়ারটা টানিয়া নেন রাস্তার দিকে ছোট্ট বারান্দায়।

কলিকাতার রাস্তা নয় যে, লোকজন আর গাড়ী-ঘোড়া দেখিয়া শনিবারের সন্ধ্যাটা আজ কাটাইয়া দিবেন। রাসবিহারী এ্যাভেন্যু হইতে বেশ খানিকটা দূরের এই পরিচ্ছন্ন পাড়াটা যেন রাতের মতই নির্জ্জন।

রমানাথ আর একটা ছোট চেয়ার বারান্দায় তুলিয়া আনিয়া ডাকিলেন, "সুরমা।"

বার কয়েক ডাকাডাকির পর গৃহিণী সামনে আসিয়া দাঁড়ান।

"একটু বোসো না।"

"কেন ?"

"কাজের কথা ছাড়া কি আর কাছে এসে বসতে নেই !"

সুরমা হাসিয়া চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "ঠাকুরটার যা এলোপাথাড়ি কাজ, সামনে না থাকলে বুঝি চলে !"

"একদিন না হয় না-চলার মত করেই চলুক।"

সুরমা অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন, "বলো কী কথা ?"

"কথা আবার কী ! এমনি বসতে নেই একটু ?" বলিয়া রমানাথ স্ত্রীর একখানি হাত কাছে টানিয়া নেন।

বাধা না দিলেও বাধ-বাধ ঠেকে সুরমার। কখন খোকা আসিয়া পড়িবে হয় ত !

"সু !"

বহুকাল অনভ্যস্ত কানে এই সংক্ষিপ্ত সম্বোধনের সুরটুকু নেহাৎ মন্দ লাগে না আজো। সুরমা মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "বয়েস হচ্ছে আর বস যেন দিন দিন উথলে উঠছে তোমার।"

মৃদু হাস্যে রমানাথ জবাব দিলেন, "বয়েসটা কি আমাদের এতই বেশী হয়ে গেছে, সুরমা ?"

"না, এখনো খোকাবাবুটি রয়েছ !" বলিয়া সুরমা হাসিতে থাকেন, "আর দুদিন বাদে ছেলের বৌ ঘরে আসবে কিনা।"

"ভাল কথা।" রমানাথ উচ্চকিত হইয়া ওঠেন, "আমাদের বিয়ের পরে তোলা সেই পেয়ার-ফোটোটা তোমার বাক্সে তুলে রেখো কিন্তু—বাইরে রেখো না আর।"

"কেন ?"

"কেন !—তখন বুঝি এতটুকুও খেয়াল ছিল তোমার !—আমার কোলের উপর কনুই রেখে পা দুটি তেরছাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে অমন

আধশোয়া ঢংটা যেন ভালো!” হাসিতে থাকেন রমানাথ—অর্থময় বাঁকানো হাসি।

হাসেন সুরমা দেবীও। স্বামীর চোখে সলজ্জ চোখ রাখিয়া কহিলেন, “ছাখ, বেশী বাড়াবাড়ি করো না। ওতে উল্টো ফলই হয়।—ছেলে তোমার রাতদিন ঘরের মধ্যেই বসে থাকে কি না, স্কুল-কলেজ নেই তার। দেশে সিনেমা-থিয়েটার নেই, বন্ধুদের বাসার পথও চিনে না, লাইব্রেরী থেকে বই আনতেও জানে না, না?”

রমানাথ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিতে থাকেন শুধু। কথাটা যে সত্য, দেওয়ালের বড় ক্যালেণ্ডারটাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তারিখগুলি থাকিলেই ত বেশ চলে। অমনধারা অর্দ্ধনগ্ন ছবি কেন বাপু! কচি ছেলেমেয়েদের মাথা খাইবার জন্য?

রমানাথ রাগিতে থাকেন—শুধু দেওয়ালপঞ্জী কেন, আজকালকার মাসিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিও বড় কম যায় নাকি? চকোলেট কিনিয়া আন, তার মধ্যেও চাঁদমুখ। পেপার-ওয়েট, টুথপেষ্টের কেস, স্নো-পাউডারের লেবেল, জুতার বাক্স, তেলের শিশি, সিঁদূরের কৌটা—কত আর বলা যায়। রাস্তায় বাহির হইলে ত রক্ষাই নাই। সাইন-বোর্ডে, শো-কেসে, দেওয়াল-বিজ্ঞাপনে, হ্যাণ্ডবিলে—আরে ওসবই বা কেন—একেবারে জলজ্যান্ত কত চাঁদমুখ বাসে, ট্রামে, মোটরে, রিকশায়, ফিটানে, ফুটপাথে—জোড়ায় জোড়ায়—একা একা।

“তাইত!” রমানাথ যেন মহা সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন এমনি ভাবেই কহিলেন, “সেকালটাই ভাল ছিল যেন।”

“আচ্ছা, ওদের রেণুর সঙ্গে খোকার বিয়ে দিলে কেমন হয়?” সুরমা কথাটি পাড়িলেন কৌতুক করিয়াই।

“তুমি পাগল না খ্যাপা!”

"কেন ?"

"—ওকে আমি বিলেত পাঠাব। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটি মাত্র ছেলে আমাদের।—যত টাকা লাগে—" রমানাথ একটু থামিয়া লইয়া কহিলেন, "যতীন বোসের শালিটির রঙ ময়লা, নইলে বিলেত পাঠাবার খরচ দিতে ত তাঁরা রাজীই আছেন।"

"তুমি বসে বসে ছেলেকে তোমার বিলেত পাঠাও, আমি উঠি এবার। কাজ আছে আমার।"

"বোস না সু! বড্ড ভাল লাগছে তোমায় আজ।"

—কথাটা অকপট সত্য, তবু কেমন বিশ্রী শোনায় রমানাথের নিজেরই কানে। তাই শুধু বোকার মত হাসিতে থাকেন।

"ঢং রাখ।" বলিয়া সুরমা উঠিয়া দাঁড়ান। ভাল লাগে কথাটা, তবু দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুরাপুরি উপভোগ করিতে লজ্জা করে বড়। হাসিয়া কহিলেন, "কৈ, পরদা কিনতে গেলে না তো ?"

"আজ থাক, কাল আনব। তুমি একটু কাছে ব'স না, অনেক কথা আছে—জরুরী কথা। খোকার বিয়ের কথা।—আচ্ছা, বি-এটা পাশ করার আগে ত আর—বয়েসটা বড্ড কম, না ? আমাদের সময় তেইশ চব্বিশের আগে বি-এ পাশ করত কে! আর আজকাল হয়েছে যত সব জাগ দিয়ে আম-পাকানোর ব্যবস্থা।—আঃ। ব'স না। একদিন গেরস্থালির কাজ বন্ধ থাকলে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে না।"

রাত্রিবেলা!

খাওয়া-দাওয়া শেষ। সুবিমল শুইবার ব্যবস্থা করিতেছে। বাবার

ঘরের দুয়ার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আলো নিভাইতে পারিতেছে না। সবে রাত সাড়ে নয়।

পুত্রকে বিস্মিত করিয়া দিয়া পিতা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ছেলের খোজ-খবর লইতে বা পড়াশুনার তদারক করিতে এ-ঘরে, বিশেষ করিয়া এমন অসময়ে, রমানাথ কোনদিনই আসেন না বা আসিলেও কদাচিৎ।

ঘরে ঢুকিতেই মনে হয় রমানাথের, আজ যেন নূতন কোথাও আসিয়াছেন। ডজন খানিক ক্যালেণ্ডার এ-দেওয়ালে, ও-দেওয়ালে। নারী মূর্ত্তির মুখ না দেখিয়া কি দিন-ক্ষণ, তিথি নক্ষত্র দেখা চলে না? আর দেখ না, যেন গিলিয়া-ফেলা চাউনি। ফোটোগ্রাফি এতও পারফেক্ট হইয়াছে আজকাল! খোকার ঘরে ত কতবার আসিয়াছেন। এতদিন কেন যে এসব নজরে পড়ে নাই, সেটাই পরম বিস্ময়ের বিষয়।

"খোকা, রাত্তিরে কতক্ষণ পড়াশুনা করিস্?—বেশী রাত জাগিস নে তাই বলে। সবে ত থার্ড ইয়ার।" রমানাথ ছেলের বিছানার কাছে চেয়ারটা টানিয়া নিয়া বসিয়া পড়িলেন। আধ-শোওয়া সুবিমল আগেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াছে পায়ের শব্দ পাইয়া।

"কত রাত অবধি পড়িস্?"

"কত আর?—দশ, সাড়ে দশ, এগার।"

"যথেষ্ট! আমিও কলেজ লাইফে এর বেশী পড়তাম না।"

ছেলে চুপ করিয়া আছে।

"হ্যাঁরে খোকা, তোর মা বলছিল, তুই নাকি কলেজ ম্যাগাজিনে পদ্য লিখিস্?"

"ও কিচ্ছু না।" বলিয়া সুবিমল সলজ্জ বিনয় প্রকাশ করে।

"বেশ ত। লজ্জার কী তাতে!—আমিও কতবার লিখেছি। একবার ছেলেরা ধরে বসল, বিদায়-সঙ্গীতের পদ্য লিখে দিতে হবে। ভাইস-প্রেন্সিপ্যাল রিটায়ার করছেন, তাকে ফেয়ারওয়েল দিতে হবে। চমৎকার কবিতা হয়েছিল নাকি।"

সুবিমল নীরবে শুনিয়া যায় পিতার অতীত কীর্ত্তিকলাপ।

"দেখি, কী লিখেছিস্?"

"কিছু হয় নি। তোমায় দেখতে হবে না।"

"ও-সব লিখতে লিখতেই হয় রে। কথায় বলে, কচুগাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত। রবি ঠাকুর একদিনেই হয় কিনা!"

সুরমা আসিয়া ঢুকিলেন এ-সময়। রমানাথ বলেন, "খোকা ওর কবিতা দেখাতে লজ্জা করছে আমার কাছে।"

"কবিতা কোথায় গো!—খোকা গল্প লিখেছে। কী সুন্দর লেখা!"

"কিসের গল্প?"

মায়ের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া নিয়া পুত্র কহিল, "ও-সব বাজে লেখা, তুমি বুঝবে না।"

"খুব বুঝব। আমিও এককালে গল্প লিখতাম রে। বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি! একবার গল্প লিখে ইস্কুলে প্রাইজ পেয়েছিলাম।"

"সে সব ছেলেমানুষি গল্প বুঝি! এ নভেলের গল্প গো। বড়লোকের মেয়েকে ভালবেসেছে এক গরীবের ছেলে;—কি না নামটা খোকা?—সুরপতি না কী যেন? মেয়েটার নাম ত ললিতা।"

খোকা মাথা নোয়াইয়া বসিয়াই আছে। পিতা বুঝিলেন, প্রেমের গল্প লিখিতেছে ছেলে। তা লিখুক না হয়। কিন্তু অত লজ্জা কেন তায়!

পুত্রের আনত আড়ষ্ট ঘাড়ের দিকে নিষ্পলক চোখে চাহিয়া আছেন

রমানাথ। চাহিয়া আছেন সুরমাও। বাপ ভাবেন, আদলটা ঠিক মায়েরই পাইয়াছে। মায়ের মনে হয়, পেছনটা আর একটু হইলেই অবিকল ওর বাপের মত।

"খোকা।"

সুবিমল মুখ তোলে।

"তোকে এবার বিয়ে দেব ভেবেছি। তোর কী মত?"

"ওর মতামত আবার জিগ্‌গেস করতে হবে নাকি?" সুরমা বলিয়া চলিলেন মৃদুহাস্যে, "বি-এ, এম-এ যতই পাশ দিস্ না কেন, আমাদের কাছে তুই চিরদিনই খোকা! আমরা যা ভাল বুঝব তাতে 'না' করতে পারবি না।"

সুবিমল মুচকি হাসিতে থাকে।

মাও হাসিয়া কহেন, "হাসলে চলবে না।"

রমানাথ আবার প্রশ্ন করেন, "সামনের ফাল্গুনে তোর বিয়ে দেব ঠিক করেছি। বেশি বয়সে বিয়ে করার কোন মানে হয় না। ওতে ঝঞ্ঝাট অনেক।"

"আমি এখন বিয়ে করব না"—সুবিমলের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও দৃঢ়।

"কেন?"

"আগে মানুষ হয়ে নিই।"

"তার জন্যেই তো বিয়ে দিতে চাই রে। তোকে বিলেত পাঠাবো।"

"পরের টাকায় বিলিতী ডিগ্রী নিতে আমি চাই না। এদেশের ইউনিভার্সিটির শিক্ষা পেয়েও মানুষ হওয়া যায়।"

রমানাথ একটু থামিয়া পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "খোকা, আমার বড় সাধ ছিল বিলেত যাবো। সে আর হয়ে ওঠে নি নানা কারণে। বিয়ে করে মোটা টাকাও নিয়েছিলাম সেই উদ্দেশ্যেই।

হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। সংসারের সকল দায়িত্ব পড়ল একা আমার ঘাড়ে।—সে সাধটা তোকে দিয়ে মিটিয়ে নিতে চাই, খোকা। তুই আপত্তি করিস নে।"

সুরমা জানালার কাছে গিয়া বাহিরে চাহিয়া আছেন। কথাটা সত্য। স্বামী বিদেশে পড়ার খরচ বাবদ চার হাজার টাকা তাঁহার বাবার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আর একটা ইতিহাস তাহার জানা নাই। না থাকাই ভাল।

দুদিনের কথা। সামান্য দুর্ব্বলতার একটি ছোট্ট অধ্যায়। পাশের বাসার সেই শ্যামবর্ণা কিশোরী (স্কুলমাষ্টার কপিঞ্জল সেনের মা-মরা সেই অনূঢ়া মেয়েটি) আজ কোথায়, কার ঘরে, কত দূরে—কে আর রাখে তার খবর!

আজ রমানাথের এতকাল পরে মনে পড়িয়াছিল সেই ভীরু চোখ দুটি—কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য শুধু—ঘণ্টা দেড়েক আগে। আবার মনের তলায় চাপা পড়ে বাইশ বছর আগেকার সেই কয়েক মাসের ছেলেমানুষি!

"খোকা কথা বল্‌ছিস না যে?"

"ভেবে দেখি—পরে বলব।"

"তা-ই ভাল। তুই তো অবুঝ নেই আর—বয়েস হয়েছে, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে শিখেছিস এখন। ভালমন্দ কি আর আমার চেয়ে তুই কম বুঝিস?"

সুরমা জানালার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে কহিলেন, "রেণুর বাবার বড্ড চাল। যা ঐ বাইরের ভড়ংটাই। ভেতরে ঢ-ঢ-ঢং।

"কেন বল তো?" প্রশ্ন করেন রমানাথ।

"তিন মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি ফেলেছে। ওদিকে তিন সের করে দুধ নেয় রোজ। বোলে চালে ছেলেমেয়েগুলোও হয়েছে তেমনি। রেণু তো এ-বেলার শাড়ি ও-বেলা পরে না। আবার মাষ্টার রাখা হয়েছে। পড়াশুনা শেখানো না হাতি, বাপ আছে সুযোগ বুঝে ঘাড়ে গছিয়ে দেবার তালে।"

সুবিমল মনে মনে হাসে। একটু করুণাও জাগে রেণুদের জন্য, একটু আবার দুঃখও হয় বাবা-মার অমন অহেতুক আশঙ্কা দেখিয়া। বরং, এতক্ষণে—আজ এই ঘণ্টা কয়েকের ছলনার পালার শেষে—মনে হয় সুবিমলের, রেণুকা মেয়েটি তো মন্দ নয়। দেখিতে খাসা, চোখ দুটিও ভাসাভাসা, ফাঁপানো চুলের খোঁপা, নাকটা নিখুঁৎ, ঠোঁটজোড়া পাতলা, কালো হইলেও কুশ্রী নয় সে, বাবার অবস্থাও ভাল নয় মোটে। গরিবের দায় উদ্ধার করিলে ক্ষতি কি!

রমানাথ স্ত্রীর উৎসাহে বাধা দিয়া কহিলেন, "পরের কোষ্ঠি কেটে দরকার নেই। চল এবার। খোকার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে।—খোকা, মন দিয়ে পড়াশুনা করবি। ভাসাভাসা জ্ঞান জিনিষটা বড় মারাত্মক। —রবিঠাকুরের একটা কী লাইন আছে না রে?—'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'। তোদের এখন সেই সময়। তলিয়ে বুঝতে হবে অনেক কিছু—অনেক কথা। পড়বি, রাতদিন পড়ার মত করে পড়বি। তবেই সব কথা খোলসা হয়ে আসবে।"

পুত্রকে আরো মিনিট দুই উচ্ছ্বসিত উপদেশ বিতরণ করিয়া রমানাথ চলিয়া গেলেন। ছেলের বালিশের ঢাকাটা অকারণেই একবার ঝাড়িয়া আর ভাঁজ-খাওয়া বিছানার চাদরটা সটান করিয়া দিয়া সুরমাও খানিক বাদে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বাবা-মার ঘরে দুয়ার বন্ধ হয় সশব্দে।

সুবিমল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। উঃ, কি ফাঁপরেরই না পড়িয়াছিল এতক্ষণ! অধুনা-প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক 'আধুনিকী'র বর্ত্তমান সংখ্যাখানি বাবার হাতে পড়িয়াছিল আর কি! একে তো মলাটের উপর হলিউডের নীলনয়না তারকাটি নায়কের কাঁধে মুখখানি গুঁজিয়া গা ছাড়িয়া দিয়া একেবারে গলিয়া পড়িয়াছে, তার উপর কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গেলেই চোখে পড়িত পুত্র 'শ্রীহীন' সুবিমল সেনগুপ্তের 'চুম্বনের' উপর ভয়ঙ্কর রকমের এক কাব্যিক অগ্ন্যুৎপাত!

ভাগ্যিস বাবার নজরে পড়িবার আগেই সুচতুর সুবিমল পত্রিকাখানির উপর আসন করিয়া বসিয়াছিল—তাড়াতাড়ি সেক্সপীয়রের ওয়ার্কসটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়াছিল পুরাদস্তুর 'অধ্যয়নং তপঃ'র ভঙ্গীতে। কি ফ্যাসাদ বাবা! বাঁ পায়ের হাঁটুর উপরে কি যেন সুড়সুড় করিয়াছে এতক্ষণ; তবু সে চুলকাইতে সাহস করে নাই ধরা পড়িবার ভয়ে। বাঁচা গেল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া সুবিমল পড়িতে বসে। বাবা পড়িতে বলিয়াছেন, রাতদিনই পড়িতে বলিয়াছেন—ভাবিয়া চিন্তিয়া তলাইয়া পড়িতে বলিয়াছেন। তথাস্তু! পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ। আজ্ঞা পালন না করিলে অনন্ত নরক। সুবিমল পড়াশুনা লইয়াই কাটাইবে—আজ হইতে, এখন হইতেই।

আপাততঃ সেক্সপীয়ারিয়ান্ ওয়ার্কসের মোটা বইটা লইয়া সুবিমল পড়া সুরু করিতে চায়। কি পড়িবে? হ্যামলেট? ওথেলো? টেমপেষ্ট? লীয়ার? অত বাছবিচার করিতে বসিলে বুঝি পড়া হয়!

ওয়ান্, টু, থ্রী—বলিয়া দুদিকের মলাট হইতে হাত সরাইয়া নিতেই বইএর মাঝামাঝি ফাঁক হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল যে দুটি পৃষ্ঠা তাহা আর কিছুই নয়—জুলিয়েট রোমিওকে বিদায় জানাইতেছে তাহার মিনতি

মাখানো ডাগর চোখের নীরব ভাষায়। সুবিমলের কি দোষ?
এ যে খাঁটি লটারি!

ও-ঘরে রমানাথ তখন দক্ষিণের সেই জানালাটার কাছে। চাহিয়া আছেন বাহিরে—কে জানে, হয়তো ও-বাসার ছাদের দিকেই।

সুরমা কাছে আসিয়া ডাকিলেন, "কত রাত করবে আর—শোবে না?"

রমানাথের চমক ভাঙ্গে।

সহাস্যে রসিকতা করেন সুরমা, "তুমিও কি পাশের বাসার কারো সঙ্গে—"

অকারণ লজ্জায় রমানাথ সঙ্কুচিত হইয়া কহেন, "কী যে বলো!"

"কেন রেণুর মার সঙ্গে—"

"সু!" মৃদুহাস্যে রমানাথ কহিলেন, "ভাবছিলাম কী জানো?—মনে হচ্ছিল, তুমি যেন ও-বাসার ছাত থেকে চেয়ে আছ এ-বাড়ীর জানালায়—আজ নয় তাই বলে, বাইশ বছর আগে।"

উত্তর পুরুষ

পৌষের পড়ন্ত সূর্য্যের দিকে চাহিয়া মলিনা এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

বেলা আর নাই। খানিক বাদে তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বলিবে। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে নামিবে অন্ধকার।—স্বামীও বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন যথারীতি আটটার মধ্যে। খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গামা মিটিতে বড় জোর সাড়ে দশটা। আর ঘণ্টা পাঁচেক। তারপর?

তারপর মলিনা আজ একবার জন্মশোধ দেখিয়া লইবে! সেই অপ্রতিহত প্রতাপের এলাকার মধ্যে তখন মার-মুখো শাশুড়ীও নাই, রায়বাঘিনী ননদিনীও না। নির্জ্জন অন্ধকারে শুধু সে আর স্বামী। রোজ রোজ আর কত সওয়া যায়। সে-ও তো মানুষ! দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হইয়াও এতদিন মলিনা বাড়াবাড়ি করে নাই নিতান্ত ভাল মেয়ে বলিয়াই। কিন্তু এত ভাল ও ভাল নয়।

সন্ধ্যা লাগে-লাগে। মলিনারও চুল বাঁধা শেষ। আজ সে বহুদিন বাদে বিনুনী করিয়া খোঁপা বাঁধিয়াছে। কেন, দুই ছেলের মা বলিয়া এ'রি-

মধ্যে সাধ-আহ্লাদ সব শেষ হইল নাকি? কোন্ দুঃখে?—আলতার শিশিটা তাকের উপর যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া মলিনা আসিয়া পশ্চিমের জানালার কাছে দাঁড়ায়। কপাটটা সটান মেলিয়া দেয়। আবছা আলোয় মুখখানি আর একবার দেখিয়া লয় পুরানো আরশিখানিতে। সন্ধ্যা লাগিতে আজো মনে হয় অনেক দেরী, অনেক। তবে?

তবু এই পড়িয়া পড়িয়া গালমন্দ সহ্য করা কেন? দ্বিতীয়পক্ষের অপবাদ তো দুনিয়া ভরিয়াই আছে। আজ দেখা যাক্!

কঠোর সঙ্কল্প কঠোরতর করিতে করিতে মলিনা আলনা হইতে আধ-ময়লা সেমিজটা আনিয়া গায়ে দেয়। আটপৌরে কাপড়খানি ছাড়িয়া গেল-পুজার মিলের সেই সস্তা ডুরে শাড়ীখানি পরে। সম্মুখে, ঐ অন্ধকার রাত্রির কোলে, তার একমাত্র আশার আলো।

গল্পের আরম্ভ কিন্তু এখানে নয়। আরো পরে। তবু গোড়ার কথা এখানে বলিয়া লইতে হয়। নহিলে কথা কাহিনী হইয়া ওঠে না।

মলিনা মানে ভূপতিচরণের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর মনে মনে এই তর্জ্জন-গর্জ্জনের আসল কারণটা কিন্তু ঠিক দাম্পত্য কলহ নয়। হেতুটা বাঙ্গালী পবিবারের সেই অতি সাধারণ সনাতন। ব্যাপার—ননদ আর ভাইএর বৌএ ঝগড়া। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু অভিনবত্ব আছে। স্ত্রীর আর ছোট বোনের চুলাচুলি বিবাদে ভূপতিচরণ প্রতিবারই পক্ষ নেয় সহোদরা মল্লিকার। বিধবা গর্ভধারিণীকে খুশী করিবার জন্য লোক-দেখানো দরদ নয় এ। দ্বিতীয়পক্ষের সহধর্ম্মিণীর উপর এ-হেন সৃষ্টিছাড়া আচরণের পিছনে আছে, কার্য্যকারণের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস।

ভূপতি জন্মিয়াছিল ঘুণধরা জমিদারের ঘরে। প্রদীপ নিভিবার আগে শিখাটা একবার বেশী করিয়াই জ্বলিয়া ওঠে। ভূপতির বাল্যজীবন

কাটিয়াছে ফাঁকা চাল-চলনের আতিশয্যের মধ্যে অতীতের কীর্ত্তিকলাপ শুনিতে শুনিতে।

মামলা-মোকদ্দমার ঝড়ঝাপটায়ও ঝাঁজরা কাঠামোটা কোন মতে খাড়া ছিল। কিন্তু পিতার মৃত্যুর বছর দুই আগেই তিন পুরুষের গোটা সম্পত্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল একাধিক পরের হাতে। বাকী ছিল শুধু সাবেককালের পাঁচিল-ঘেরা নোনায় ধরা বসত বাটিখানি। তা-ও ছোট বোন মল্লিকার বিবাহে শ্রীনাথ কুণ্ডুর কাছে দ্বিতীয় মর্গেজে আটক পড়িয়াছে। অর্থের অভাবেই রাধানাথ চাটুজ্জ্যের মেয়েকে কিনা শেষ কালে দিতে হইল বংশজের হাতে—তা-ও আবার নলগাঁয়ের চক্কোত্তিদের ঘরে। মল্লিকার চোখে জল দেখিলেই পিতৃপিতামহের পারলৌকিক মনস্তাপ সে নাকি পরিষ্কার অনুভব করে।

তাই মল্লিকা বড় বেশী আদরের—মা দাদা উভয়েরই। শ্বশুরের ঘর আর ক'দিনই বা সে করে! এক একবার আঁতুড়ে যাইতে আসে, আর তার দাদাকে যেন একেবারে ফতুর করিয়া রাখিয়া যায়। যায় মানে, আবার দুদিন বাদেই আসে। ছ'-মাসে ন-মাসে নড়িতে চায় না।

না চাক্, থাকুক্ বাপের বাড়ী যতদিন ইচ্ছা তার। মলিনা আপত্তি করে নাই কোনদিনই। কিন্তু কথায় কথায় ভ্রাতৃবধূর পিতৃকুলের উপর বিশ্রী কটাক্ষ করিয়া রাতদিন এত গুমর কিসের? আর, ভাইএরও তার দাপট কত! তবু যদি আজ একটি কাণাকড়িও থাকিত! অথচ পুরোহিতের মেয়ে বলিয়া শাশুড়ী দেন খোঁটা। স্বামী শোনান—যেমন ঘরের মেয়ে তার তেমমি তো মন। ননদ মল্লিকা আর এক ধাপ উপরে উঠিয়া বলিয়া বসে—চালকলা-খেকোর গোষ্ঠি আর কত ভাল হয়!

মলিনা না হয় গরীবের মেয়ে—নৈবেদ্যের চাল ফুটাইয়া আর যজমানের গামছা পরিয়াই না হয় বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এদিকে বড়ঘরের

বংশধর যে তার বৌ-ছেলের দু'বেলা দুটি ভাত যোগাইতেই গলদঘর্ম্ম। যাদব পালের গদিতে সারাদিন খাতা লিখিয়া পায় ত মোটে পনের টাকা। বড় ছেলে বীনুর তো বার বছরে পা না দিতেই পড়াশুনার পাট খতম। স্কুলের আর দোষ কি? ছ'মাসের মাহিনা বাকী পড়িলে নাম কাটিয়া না দেয় কে? তবু বাপের মান কত! হেডমাষ্টারকে গিয়া ধরিয়া পড়িবে—নিজের ছেলের জন্য একটুখানি নরম হইবে, সর্ব্বনাশ! অতখানি নীচু হইবে রাধানাথ চাটুজ্জ্যের ছেলে? ছেলেটা তাই মানুষ হইল না। সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় যত সব ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে। তাতেও বাপের শিরচ্ছেদ অপমান। ছেলেও তেমনি এক গোঁয়ারগোবিন্দ! ,ডাইনে যাইতে বলিলে বাঁয়ে যায়। তার অকাজের অন্ত নাই। তিলিপাড়ার মেয়ে মহলের ফাইফরমাস খাটে। পাঁচি ধোপানীর নাকি রুক্ষ এলোচুলের উকুন বাছিয়া দেয়। অনুরোধ করিতে না করিতেই পরাণ ছৈয়ালের কাছে বেড়া বাঁধা শিখে। বিড়ি টানিবার অভ্যাস ধরিয়াছে এই বয়সেই। পাড়ার লোকে নালিশ করে যখন-তখন। দেখিয়া শুনিয়া বাপ রাগে ফোলে। ঠাকুরমা ছি-ছি করে। মাও লজ্জায় মরে।

সে সব কথা যাক্। কিন্তু, আজ এক উঠান পাড়াপড়শীর সামনে মল্লিকা তার ভ্রাতৃবধূর চৌদ্দপুরুষের কোষ্ঠী কাটিবার কে? মলিনাও পাল্টা জবাব দিতে ছাড়ে নাই। আর একজনের তাহাতে গায়ে জ্বালা ধরে কিসের জন্য? বোনের হইয়া ভাই আসিলেন রুখিয়া রান্নাঘরের দোর-গোড়ায়। চোখ রাঙাইয়া মুখ খিঁচাইয়া অমন কাণ্ড করিতেও নাকি বড়ঘরের বড় মনে বাধে না! কি বিশ্রী মুখ! আজ মলিনাকে শুধু হাতে ধরিয়া মারাটাই বাকী রাখিয়াছে!

অস্তমান সূর্য্যের দিকে চাহিয়া মলিনা তাই আজ ভিতরে ভিতরে ফুলিয়া

ঝাঁপিয়া উঠিতেছে দারুণ আক্রোশে। অন্ধকারই ভালো। রাত্রিবেলাই তার সংসার—দিনের জগৎটা কারাগার! মলিনা খোঁপাটা অকারণেই আরো একবার ঠিক করিয়া লয়। আজ একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ছাড়িবে।

সন্ধ্যার পর। ভূপতি সকাল করিয়াই গৃহে ফিরিল। গল্পের আরম্ভ কিন্তু তখনো নয়।

সন্ধ্যা প্রদীপটা এখনো নিভে নাই। ঘরের মধ্যে আধ-আধ আলো। কোলের ছেলেটা ঘুমাইয়া আছে নিজের বিছানায়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের এখনো দেখা নাই—কখন ফিরে ঠিক কি। ভূপতি ·আস্তে আস্তে আসিয়া বিছানার এক কোণে বসে। বসিয়া পড়িয়া বহুদিনের পুরাণো নোংরা কেড্-স্ জোড়া খুলিয়া ফেলে

হতভাগা ছেলেরও এতক্ষণে বাড়ী ফিরিবার সময় হইল। বীনু আসিয়া ঘরে ঢোকে। বাপের মত অমন চুপি চুপি নয়। ভূপতি আর সে ভূপতি নাই। গলা খাটো করিয়া জিজ্ঞাসা করে বীনুকে, "তোর মা কোথায় রে?—রান্নাঘরে?"

"আমি তার কী জানি?" একরত্তি ছেলে অসম সাহসে, বাপের উপর রীতিমত ঝাঁজিয়া ওঠে "আমি যেন এতক্ষণ বাড়ী ছিলাম।"

বাপ আপাতত চুপ করিয়া যায়। এতক্ষণ কোথায় ছিল তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়া এই রাত্রিবেলা একটা কেলেঙ্কারির সৃষ্টি করিতে নানা কারণে রাজী নয় এখন।

রান্নাঘর হইতে মা ডাকে, "বীনু!"

"যাই মা!"

এবার মিষ্টি করিয়া সাড়া দেয় একান্ত বাধ্য ছেলে।

দাদার গলার আওয়াজ পাইয়া ও-ঘর হইতে মল্লিকা আসে এ-ঘরে। ফিস্ ফিস্ করিয়া ভাইএর কাণে লাগায়, "শুনেছ দাদা বীনুর কাণ্ড?"

ও-বেলার ভগ্নীবৎসল দাদা কিন্তু এ-বেলা শুনিবার জন্য এতটুকু আগ্রহ দেখায় না।

"শুন্‌ছ তো—জগু মালাকারের মেজ ছেলের বৌএর কাল সাধ। বীনু আজ তাদের বাজার ক'রে দিয়ে এসেছে। কাল নাকি আবার নেমন্তন্নে যাবে সেখানে।"

বংশাভিজাত্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সাড়া দেয় না তবু।

মল্লিকা বলিয়াই চলিয়াছে, "কাল দুপুরে নাকি দত্তদের বাগানে নারকেল চুরি করতে গিয়েছিল। কী ঘেন্নার কথা বল তো! বাপ-ঠাকুরদার নাম ডোবালো।"

ভূপতি তবু নির্ব্বাক।

ওর মার আস্কারা পেয়েই না এতটা—"

"থাম না রে বাপু!" এবার ভূপতিচরণ উষ্ণ হইয়া ওঠে, "সারাদিন খেটে খুটে এসে তোদের এ সব ঝামেলা আর ভাল লাগে না আমার।"

ভাল রে ভাল! ভগ্নী মুখ কালো করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারের ওপিঠে মন্দাকিনী মেয়ের অপমানে ফোঁস করিয়া ওঠে, "তোর অত পরের কথায় থেকে কাজ কি শুনি। আয় না চলে। বাবা! ভাল বললেও মন্দ শোনে। বৌএর নামে এতটুকু বললেই মেজাজ চড়ে যায়!"

ভূপতি এবার গলা ছাড়িয়াই জানাইয়া দেয়, "রাতদিন এসব কেলেঙ্কারি আমার ভাল লাগে না বলে রাখছি।"

"তা আর লাগবে কেন! ছোট থেকে বড়টা করেছিলাম আমিই কিনা।

আর আজ বড় আপন জন পেয়েছিস্। বলিয়া মন্দাকিনী মেয়েকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া যান গজগজ করিতে করিতে।

ভূপতি একটু নিশ্চিন্ত হয়। গলা ছাড়িয়া উভয়পক্ষে যে বাক্য বর্ষণ হইয়া গেল রান্নাঘরে তাহা যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে নিশ্চয়ই।

মলিনা তখন রান্নাঘরে পুত্রকে আর এক টুকরা মাছ দিয়া কহিল, "খেয়ে নে শিগ্ গির করে—তারপর চুপচাপ শুয়ে থাক গে।"

"আমি আর ও-ঘরে শোব না মা—তোমার কাছে শোব আজ।"

"না।"

"ঠাকুমা আর ছোট পিসি তোমার নামে কত কথা বলে মা—আমি সেদিন শুয়ে থেকে শুনেছি সব। ওদের কাছে শোব না আর।"

মা গম্ভীর হইয়া কহে, "যা বল্‌ছি তাই শোন।—আমার ঘরে আজ জায়গা হবে না। ভাল চাস তো, খেয়ে দেয়ে ঠাকুরমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়।"

মলিনা ছেলেকে কিছুতেই আজ কাছে রাখিবে না। কোলের ছেলেটা নেহাৎ কোলের বলিয়া এক কোণে ঘুমাইয়া থাকিবে—তা সে না থাকার মতই।

রাত বাজে এগারটা। মলিনা আলোটা নিবো-নিবো করিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া ওঠে।

আসল গল্প আরম্ভ হয় এতক্ষণে।

একদিকে ভূপতি যথাস্থানে চুপ করিয়া শুইয়া আছে। বিছানার আর এক কিনারায় খোকনের ছোটছোট কাঁথা-বালিসের বিছানাটুকু। মাঝখানটাই প্রথামতই মলিনার।

মলিনার মতলব সত্যই ভাল নয়। আস্তে আস্তে খোকনের আলগা বিছানা মাঝখানটায় সরাইয়া দিতেথাকে। প্রতি রাত্রের এই নিয়মকানুনে আজ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে এ আশঙ্কা ভূপতি সন্ধ্যা হইতেই করিয়া আসিতেছিল। খপ্ করিয়া স্ত্রীর হাত চাপিয়া ধরে, "ও কি মিনা!"

মলিনা জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া নেয়

"রাগ করেছ মিনা? ছি!"—ভূপতি স্ত্রীর পুনঃ সঙ্কল্পে আবার বাধা দেয়। মলিনা এবারও ঝটকা দিয়া স্বামীর হাতখানি ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়।

গতিক ভাল নয়! খানিকক্ষণ বোকার মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়া ভূপতি বুদ্ধিমানের মত সুরু করিল সারাদিনের একটানা খাটুনির লম্বা ফিরিস্তি দিতে। "এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর তোমাদের সংসারের এ সব শতেক ঝঞ্ঝাট সত্যি ভালো লাগে না। মাথায় খুন চাপে। কী বলতে কী সব বলে ফেলি। সে বুঝি আমার মনের কথা! আর..."

কিন্তু মলিনা এখন কালা।

"মিনা।"

মলিনা আজ বোবা।

"ছি লক্ষ্মীটি! অমন করতে নেই। ওবেলা রাগের মাথায় যা-সব বলেছি সে তুমি এখনো মনে করে রেখেছ!" বলিয়া ভূপতি স্ত্রীর গা ঘেঁসিয়া বসিতে চায়। মলিনাও এক নিমেষে সরিয়া বসে হাত খানিক ব্যবধানে।

"রাতদুপুরে এ-সব আর ভাল লাগে না গো, সত্যি বলছি।"—স্ত্রীর কাছে সরিয়া গিয়া এক হাত বুকের উপর তুলিয়া ধরে ভূপতি।

মলিনা এবার অতটা বাধা দেয় না।

প্যাঁচ খেলিতে হইলে আগে বেশ খানিক নাটাইএর সূতা ছাড়িয়া লইতে হয়।

"আঃ আবার মুখ ফেরাচ্ছ!"—মলিনার খোঁপাশুদ্ধ মাথাটা বাঁ কাঁধে টানিয়া নিয়া গলিয়া-পড়া ভঙ্গীতে ভূপতি কহিল "একবার তাকাও না ইদিকে! এখনো বুঝি রাগ আছে?"

মিনিট দুই স্বামীর বিগলিত বাক্যস্রোত সহ্য করিয়া মলিনা কাঁধ হইতে মাথা সরায়। সময় হইয়াছে।

স্বামীর মুখের উপর এক পলকের দৃষ্টি বুলাইয়া লয়। এইটুকুই যথেষ্ট। এই আধ-আলো আধ-অন্ধকারেও এতদিনের এই লোকটার চোখ-মুখের ভাষা তার কাছে অতি স্পষ্ট—মুখস্ত তার প্রতিটি ভাবান্তর। মনে মনে হাসে মলিনা—অদ্ভুত হাসি। দিনের বেলার সেই অনমনীয় বংশাভিমান এত সহজ, এত সস্তা! আজ মলিনা এত সকালে সাড়া দিবে না। স্বামীর মুখ হইতে কত কথাই না সে আদায় করিয়া লইয়াছে কতবার! কিন্তু প্রতিবারই রাতের কোকিল ভোর না হইতেই বুলি ভুলিয়া আবার কাক সাজে। আজ মলিনা শত কাকুতি-মিনতিতে গলিবে না। কিছুতেই না। খানিক—আরও বেশ খানিক খেলাইতে হইবে। প্রাণান্ত খেলা!

"কথা বল্‌ছ না যে?"

মলিনা শিথিল-করা দেহ আবার আড়ষ্ট করে।

এক গাল হাসিয়া ভূপতি কণ্ঠলগ্ন হইতে চাহিল, "কথা কও মিনা।"

জবাব দিল মলিনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিনীত আপত্তি। স্বামীর বাহু-বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার কপট চেষ্টা করিয়া জানায়, "আঃ! ভাল হবে না কিন্তু—ছেড়ে দাও বল্‌ছি।"

যা-হক এতক্ষণে মুখ খুলিয়াছে মলিনা। খুশী হয় স্বামী। কিন্তু পরক্ষণেই স্ত্রী আবার বোবা!

তাই দ্বিগুণ উৎসাহে ভূপতি এবার স্ত্রীর নাক টিপিয়া তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস খানিক বন্ধ করে ঠোঁট খোলাইবার আশায়।

মুখ ঝামটা মারে মলিনা—"ছেড়ে দাও।"

"রাগ করোনা লক্ষ্মী মাণিক আমার।"

"অ্যাঁ! সোহাগ দেখে মরে যেতে ইচ্ছে যায়।"

"এ-কথা বল্‌ছ কেন মিনা? আমি বুঝি তোমায় ভালবাসি না।"

"অমন ভালবাসার মুখে আগুন!—ভালবাসা! তোমায় চিনতে আর বাকী নেই।" বলিয়াই মলিনা উঠিয়া পড়িতে চায়।

নাছোড় ভূপতিচরণ স্ত্রীর মাথাটা দুহাতে বুকের উপর চাপিয়া ধরে। মলিনা এবার অনর্গল বলিতে থাকে, "ছোটলোকের বেটির সঙ্গে এক বিছানায় শুতে বুঝি লজ্জা করে না!—ঘেন্নারও কথা!"

"ও-সব ঝগড়ার কথা তুলো না এখন।"

মলিনা রুখিয়া ওঠে, "কেন তুলব না? তুমি বলতে পার আর আমি বুঝি—"

"তোমায় আগে আমি ও-কথা বলেছিলাম, বলো।"

"তুমি না বলেছ তোমার বোন বলেছে।"

"তা তার সঙ্গে বুঝবে!"

"তার সঙ্গেই তো বুঝতে চাই", মলিনা তীব্র আক্রোশে ফুলিয়া ওঠে, "তুমি এসে মাঝখানে পড় কেন শুনি?"

"তুমি আমার বাপ-ঠাকুরদাকে ছোটলোকের বংশ বলে—"

মুখের কথা কাড়িয়া নেয় মলিনা, "তোমার বাপ-ঠাকুরদাকে এতটুকু বললে তোমার গায়ে লাগে, আর আমার বুঝি বাপ-ঠাকুরদা নেই? তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে, আমার বুঝি গণ্ডারের চামড়া?"

ভূপতি চুপ করিয়া থাকে। দিনের বেলার ইতিহাস রাত্রে বড় বেসুরা ঠেকে! মনে হয় এ স্ত্রী-ই তার সব। মলিনা আছে বলিয়াই যেন এ-জীবনের অর্থ হয়।

তিক্ত প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ভূপতি তাড়াতাড়ি রসাল পথে মোড় ফিরিল, "তোমায় আজ ভা-রী সুন্দর দেখাচ্ছে মিনা। সত্যি বলছি। কতকাল যে এমন সুন্দর করে খোঁপা বাঁধো নি।' বলিয়া মলিনার নাকের ডগাটা টিপিয়া দিয়া একটু সোহাগের দৌরাত্ম্য জানাতে চাহিল।

সুকঠিন মলিনা একটু একটু করিয়া শিথিল হইতে থাকে।

"সত্যি গো, চমৎকার মানিয়েছে এই খয়ের রঙের ডুরে শাড়ীতে।"—ভূপতি মলিনাকে এবার অনায়াসেই বুকের কাছে শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া পড়ে জোড়া-বালিসে। তারপর পা দিয়া লেপখানি উভয়ের গায়ের উপর তুলিয়া লইতেই মলিনা বাধা দেয় "ছাড়ো।"

"কেন ?"

"আমি তো এ-বাড়ীর দাসী-বাঁদী। মান অপমানের ভয় নেই তোমার ?"

ভূপতি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "আজকাল বড্ড কথা শিখেছ মিনা।"

"আমি তোমার কে ?"

"তুমি ?—তুমি—"

"কেউ নই।"

অসহিষ্ণু ভূপতি জবাব দেয়, "তুমি আমার সব মিনা।"

"তা জানি। কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরালে পাজি! কাল সকালে এ কথা আর মনে থাকবে না।"

"নিশ্চয় থাকবে। দেখে নিয়ো।" অকৃত্রিম ভূপতির প্রতিশ্রুতি।

"এ তোমার মনের কথা নয়।" ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার মুহূর্ত্ত সমাগত।

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ"—নিরুপায় ভূপতির কণ্ঠস্বর কাঁপিতে থাকে।

"দিব্বি কর।—আমার গা ছুঁয়ে বলো—"

"এই তোমায় ছুঁয়ে দিব্বি করছি।"

আরো একটা কাজ বাকী আছে—আসল কাজটাই। এ তাহার ভূমিকা মাত্র।

মলিনা এতক্ষণে স্বেচ্ছায় স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া কহিল, "সামনের মাসে মাইনা পেয়েই আমায় দুটো টাকা দিতে হবে কিন্তু—আগে থেকেই বলে রাখছি।"

"দেব"—ভূপতির জবাব সুস্পষ্ট, অচিন্তিত।

"মাসে দুটো করে টাকা দিতে হবে আমার হাতে। ভুলো না যেন!"

"তাই হবে।—তোমার রুলি জোড়া ভেঙ্গে আবার নতুন করে গড়াবে বুঝি?"

"আমার মরণ! রুলি পরবার কপাল নিয়েই যেন এসেছিলাম।"

"তবে?"

"তবে আবার কী? মাসে দু'টাকা করে জমলেও তো বছরে হয় পঁচিশ টাকা গো। তোমার হাতে যদি একটা পয়সাও থাকে! বীনু দীনুর কথা তুমি ভাব একবার?"

"ঠিক বলেছ। আমার হাতে একটা পয়সাও থাকে না। তুমিই এখন থেকে—"

বাধা দিয়া মলিনা বলিয়া চলে, "থাকবে কেমন করে? একটা না একটা বোন বাপের বাড়ী পড়েই আছে। ছোট ঠাকুরঝি তো বারো মাসের এগারো মাস এখানেই কাটায়। তোমার যদি কোনদিকে এতটুকু হুঁস থাকে। বোনেরা যার যার সব গুছিয়ে নিচ্ছে তোমার ঘাড়ে পা দিয়ে। নিজের ভবিষ্যৎটা ভাব একবার? তুমি তো পালের গদিতে খাতা লিখেই জীবন কাটালে। ছেলেটার অদৃষ্টে সে মুবদও লেখা নেই। ওর

যা দশা হবে তা কেবল আমিই জানি। ছেলে তোমার একদিন ঐ পালেদের দোকানে, দেখে নিয়ো, তামাক সাজার কাজ নেবে।"

ভূপতি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে গিয়া নিজেকে সামলাইয়া লয়। দিনের বেলা হইলে পুত্র সম্পর্কে এ হেন অপমানসূচক উক্তি শুনিয়া সে হুঙ্কার দিয়া উঠিত। এ যে রাত্রিবেলা! সহজের আসরে বড় শক্ত ঠাঁই। দিনের আলোয় চোখ মেলিতেই নজরে পড়ে পূর্ব্বপুরুষদের ইটবার-করা জীর্ণ ইমারত, চুণ-বালি-খসা পাঁচিলের সীমানা, খিড়কির পুকুরের ভগ্নপ্রায় বাঁধানো ঘাট, পরিত্যক্ত চণ্ডীমণ্ডপ—বাড়ীর সীমানা পার হইতেই ঠাকুরদার আমলে তৈরী পাকা সড়ক রহমৎপুরের মাঠের বুক চিরিয়া একটানা চলিয়া গিয়াছে শালদহের বাজারে—দুদিকে তাহাদেরই এককালের একান্ত বাধ্য প্রজাদের ঘনবসতি—বাজার, ইস্কুল, ডিস্পেন্সারী, খেলার মাঠ—প্রত্যহ দুবেলা যাতায়াতের পথে একে একে চোখে পড়ে প্রাক্তন আধিপত্যের নিশানা সব।

কিন্তু মধ্যরাত্রের এই নিষুতি নিরালায় চাপা পড়ে ভূপতির সকল অভিমান —অবাধ্য জোয়ারে ডোবে অতীত ও বর্ত্তমান!

"কথা কইছ না যে?" মলিনা স্বামীকে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়া কহিল।

"হুঁ।"

"হুঁ, হ্যাঁ ছেড়ে আমার কথার জবাব দাও!"

ভূপতি অকারণেই একটু কাশিয়া লইয়া আস্তে আস্তে কহিল, "ছাখো, বীনুর মা! পিসিমাদের জন্যে বাবা আমার কত কী-ই না করেছেন। সে-তুলনায় বোনেদের জন্যে আমি কতটুকুই বা করে থাকি বলো।"

মলিনার চোখে আগুন জ্বলিয়া ওঠে। আবার সেই বাপ-ঠাকুরদা! অসহ্য! সর্ব্বস্ব দিয়া এক দুর্ব্বল পুরুষের মন হাতের মুঠায় আনিয়াও আনিতে পারে না যে অনড় বাধার জন্য—বংশমর্য্যাদার সেই মৃতদেহে

ক্রুদ্ধ ক্রূর একটা গোখ্রো সাপেরই মত মলিনা মনে মনে ছোবল মারিতে থাকে বার বার। তবু ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না।

মলিনা সহসা উঠিয়া বসে। শুক্নো চোখে স্বামীর মুখের দিকে খানিক নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ে এবার। দেখিতে দেখিতে চোখের জল তার দু'গাল বাহিয়া নামিতে থাকে। ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল বিমূঢ় স্বামীর সম্মুখে। রাত দুপুরের নিরালা ঘর ঘোলাটে হইয়া ওঠে।

ভূপতি এবার ভূপাতিত। মলিনাকে বুকে টানিয়া নিয়া কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনার সুরে বলিতে থাকে, "কেঁদো না মিনা! আজ থেকে তুমি যা বলবে, আমি সব শুনব।"

মলিনা ক্রন্দনের বেগ বাড়াইয়া দেয়।

"তোমায় ছুঁয়ে এই আবার আমি দিব্যি করছি, তুমি আমার সব— তোমায় আর কিচ্ছু বলব না কোনদিন।"

মিনিট কয়েক বিস্তর সাধ্যসাধনার পর মলিনা ঠাণ্ডা হয়। চুপ করিয়া শুধু কথা শোনে স্বামীর। ভূপতি নিশ্চিন্ত মনে স্ত্রীকে আরো কাছে টানে।

মলিনা সহসা কি ভাবিয়া বুকের উপর আঁচল টানিয়া দেয় লজ্জায়।— বুঝি অপমানের লজ্জায়। সে শুধুই একটা প্রয়োজন? নেহাৎ একটা নিরুপায় উপায়?

হতভম্ব ভূপতি স্ত্রীর গায়ে মাথায় হাত বুলায়, সান্ত্বনা দেয়, আদর জানায় বার বার। মলিনার সকল দাবী আর একবার এক নিঃশ্বাসে স্বীকার করিয়া লয়। তবু মলিনা নির্ব্বিকার।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করিয়া ভূপতি ডাকে, "মিনা!"

এ পক্ষে অসহিষ্ণু জোয়ার। অপর পক্ষে অনিচ্ছুক ভাটা থাকিলে কি

হইবে ,সাড়া দিতেই হইবে। পুরনো বলদের মত জোয়ালে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে অভ্যস্ত আকর্ষণে। নিরুপায় মলিনা। নিষ্কৃতি নাই। দিনের মত তার রাত্রিও কারাগার !

স্ত্রীর ভিজা গালে চুমু খাইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে ভূপতি ডাকে "মিনা !"

"কী ?"

"কথা বলো।"

"তার আগে বলো—আমায় ছুঁয়ে নয়, আমি আর কেউ নই, বাসি হয়ে গেছি—খোকাকে ছুঁয়ে বলো—তোমার বংশধরের মাথায় হাত রেখে বলো"—সহসা উত্তেজিত হইয়া মলিনা বাঁ-হাতে বিছানা শুদ্ধ খোকাকে কাছে টানিয়া আনে, "বলো, ওকে ছুঁয়ে বলো।"

"ওকি বীনুর মা !"—কম্পিত কণ্ঠে ভূপতি অনুনয় জানায়।

"তবে এই তোমার পিতিজ্ঞে করা !—ছেড়ে দাও আমায়।"

ছাড়িয়া দেয় না ভূপতি। এখন ছাড়া যে একেবারেই অসম্ভব !

স্ত্রীর বুকের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া ওপাশে ঘুমন্ত সন্তানের মাথা ছুঁইয়া সেদিন পিতা যখন গুটিকয়েক কঠিন শপথ করিয়াই বসিল, রাত তখন আড়াইটা বাজে।

পরদিন সকালে।

মলিনার আজ অনেক দায়, অনেক ভাবনা। বুকভরা তার অনেক আশা। বীনুকে আজ বই লইয়া বসিতে বলিবে। প্রায় দুই বৎসর হইল পড়ার পাট খতম। দিনে দিনে ছেলেটা যে গোল্লায় যাইতেছে। ভদ্রঘরের ছেলের নাকি আবার লেখাপড়া না শিখিলে চলে ! ওর কিচ্ছু না হইলে দেখাদেখি ছোটখোকাও মানুষ হইবে বুঝি !

কিন্তু এদিকে জননীর আদেশ—উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া হতচ্ছাড়া ছেলে কখন পাড়ায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মলিনা আজ সত্যই রাগে। বাড়ী ফিরিয়া আসিলে আজ ওরই একদিন আর তারই একদিন।

রৌদ্রের তেজ ক্রমে বাড়ে। সূর্য্য পূবদিকের বাগানের প্রকাণ্ড জাম গাছটার মাথা ছাড়াইয়াছে। এ-কথায় সে-কথায় কখন আবার আজও ননদ ভাই-এর বৌ-এ ঠোকাঠুকি লাগিয়া গেল।

শাশুড়ী আসিয়া যথারীতি মেয়ের পক্ষে দাঁড়াইলেন। গতকল্যকার সন্ধ্যা রাত্রের অপমানটা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁর কথার উপর মলিনা কিন্তু এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই। কিন্তু ননদের বক্রোক্তি তাহার অসহ্য। অত ভয়-ই বা কিসের? আজ তার খুঁটির জোর আছে। কাল রাত্রে সে বংশধরের মাথায় হাত দিয়া অমোঘ অস্ত্র তৈরী করাইয়া রাখিয়াছে।

মল্লিকা হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া নানান ভঙ্গীতে টগবগ করে, "বলব না?—এক শ' বার বলব! ছোটলোকের বেটি।"

সমান তেজে মলিনাও পাল্টা কথা শোনায়, "ভেবে চিন্তে কথা কয়ো ঠাকুর ঝি। বাপ-মা তুলে গালাগাল দিতে সবাই জানে।"

"শুনলে দাদা?" মল্লিকা দাদাকেও জড়াইয়া লইতে চায়, "শুনলে তো তোমার বৌয়ের কথা?"

ভূপতি আজ নির্ব্বিকার। চুপ করিয়া বারান্দায় বসিয়া হুকা টানিতেছে। আজ সে সঙ্কল্প করিয়াছে, কোন পক্ষেই যোগ দিবে না। সত্যই মল্লিকা বড় বাড় বাড়িয়াছে। হইলই বা সহোদরা তাই বলিয়া পরের সংসারে এতখানি আধিপত্য চলিবে কেন?

এদিকে কথার পিঠে কথা গড়ায় অনেক দূর। মল্লিকা অবশেষে বলিয়া বসিল, "চশমখোর চামারের গোষ্ঠি।"

মলিনা আবার সাবধান করিয়া দেয়, "নিজের দিকে চেয়ে কথা কয়ো ঠাকুর ঝি! তোমারও বাপ-মা আছে।"

"যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার বাপ-মার পায়ের যুগ্যি হলে চৌদ্দ পুরুষ বর্ত্তে যেত তোমার। নলগাঁয়ের চক্কোত্তিদের না চেনে কে? —জোচ্চোরের বংশ; চৌদ্দ পুরুষ চামার।"

"চামার তোমার চোদ্দপুরুষ।"

সর্ব্বনাশ !!

ভূপতি এক লাফে ছোট্ট উঠানটুকু পার হইয়া রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া গর্জ্জিয়া ওঠে, "মুখ সামলে কথা বলিস্।"

কালরাত্রের ইতিহাস ভূগর্ভে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। দিনের আলোতে মাথা চাড়া দিয়া ওঠে পলাশপুরের ডাকসাইটে জমিদার বংশের পঞ্চম-পুরুষ।

মলিনা এক মুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। পরক্ষণেই সমান তেজে বলিয়া উঠিল, "বটে! মুখ সামলে কথা বলব আমি, আর ভাই সোহাগী বোন্ তোমার যা খুশি তা-ই বলে পার পেয়ে যাবে!"

"চুপ কর হারামজাদী!" ভূপতি হুঙ্কার ছাড়ে।

স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিল মলিনা।

সুযোগ বুঝিয়া এদিকে মল্লিকার মুখ কামাই নাই,—"বলবো না! মানী আমার! তাকে ফুলচন্দন দিয়ে রাতদিন পূজো করবে সবাই!"

মলিনা চুপ করিয়া চাহিয়া আছে। এ কি সেই লোক কাল রাত্রের সেই পরাজিত পুরুষ? খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্বামীর মুখের উপর হইতে ক্রুর দৃষ্টিখানি গুটাইয়া আনে। নির্ভীক ভূপতিও চোখ রাঙায়, "কী করতে পারিস্ তুই!"

"আচ্ছা! দেখা যাবে।" বলিয়া মলিনা সরিয়া পড়ে রান্নাঘরের মধ্যে।

বারান্দা হইতে মল্লিকা তখনো নানান ছাঁদে শাসাইতেছে।

উনানের মুখের জ্বলন্ত কাঠটা অকারণে ভিতরে গুঁজিয়া দিয়া মলিনা চাহিয়া থাকে অবরুদ্ধ অগ্নিশিখার দিকে। বুকটা তার এখন নিষ্ফল আক্রোশে অমনি করিয়া জ্বলে।

মণিহারা ফণিণীর মতো ভেতরে ভেতরে ফুলিতে থাকে মলিনা। সে না হয় কেউ নয় আর। কিন্তু ছোট খোকা? তাঁর বংশধর? নিজের ছেলের অকল্যাণের ভয় ডরও নেই লোকটার? হায় ভগবান!

মলিনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসে শোবার ঘরে। ঘুমন্ত শিশুর মাথায় হাত রাখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠে। মা হইয়া কোন প্রাণে কাল রাত্রে সে অমন কচি ছেলেটার মাথায় নিষ্ঠুর মানুষটার হাত টানিয়া নিল! বাপের কাছে ছেলের চেয়েও বড় আর কে? তা-ও মা আছে। থাকুক। খোকার কেউ নাই। বীনুরও বাপ মরিয়াছে। আজ হইতে মলিনা বিধবা!

বড় ছেলে গুণধর বীনু আলমারীর আড়ালে এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে আত্মগোপন করিয়া ছিল। মুসলমান পাড়ার এক সমবয়সী ছেলের সঙ্গে মারামারি করিয়া হাত কাটিয়া এই অসময়ে বাড়ী আসিয়াছিল জল-ন্যাকড়ার ব্যবস্থা করিতে। ইতিমধ্যে মা-ও আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে।